জীবন-বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ



ডক্টর হরিদাস গুপ্ত

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VI Vide Notification No. TB/74/VI/LS/43 and also Board's Letter No. 10367/G, dated 24. 11. 75

জীবন-বিজ্ঞান

[প্রথম ভাগ : ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

ডক্টর হরিদাস গুপ্ত, এম্.এস্.-সি., ডি.ফিল্.,
অধ্যক্ষ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী,
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, জীব-বিজ্ঞান ও প্রাণিতত্ত্ব বিভাগ ;
ভূতপূর্ব জীব-বিজ্ঞানের অধ্যাপক, মণিমালা গার্লস কলেজ
(অধুনা 'মহিলা কলেজ'), আসানসোল
এবং
জীব-বিজ্ঞান প্রবেশ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান প্রয়োগ সমীক্ষা
(১ম ও ২য় খণ্ড), জীব-বিজ্ঞান (পি. ইউ.), *Practical Zoology*
(B.Sc.), বিজ্ঞানভারতী (১ম ও ২য় খণ্ড) প্রভৃতি
বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের প্রণেতা ;
কলিকাতা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক ;
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট
কাউন্সিলের সভ্য।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রকাশক :
কে. বসু,
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৭৫
মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ১৯৭৬
মুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭
মুদ্রণ : জানুয়ারি, ১৯৭৮

Paper used for printing of this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.

মূল্য : টা. 3·40

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু,
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

SYLLABUS IN LIFE SCIENCE FOR CLASS VI

100 pages (50 pages—reading matter and 50 pages—illustration and diagrams. Printing—Pica type, size of the book 1/16 double demy, size of the diagram 3″ × 2″ minimum)

(1) Student and his environment. [10 pages]

(2) Acquaintance with various living and nonliving forms of their own environment. Popular names of common live forms—plants and animals. Popular names of and general idea about (a) lotus, (b) mango, (c) national bird (peacock), (d) national animal (tiger). [20 pages]

(3) Observation of living objects with an eye to the training of the sense organs of the students leading to general inference. [25 pages]

(4) Observation of living objects through simple experiment : —requirement of light, air (oxygen), water and nutrients for their existence. [25 pages]

(5) Basic external structure in (a) plant........example (pea), (b) animal....(fish & man). [20 pages]

N.B. :—Field excursion (at least 15) will have to be arranged so that the students may have direct idea about plants and animals in their own environment.

জীবন-বিজ্ঞান

[প্রথম ভাগ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার্থী ও তার পরিবেশ

শিক্ষার্থী

আমাদের দেশে ছেলে-মেয়েরা খুব কম বয়সেই বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শুরু করে। শহরে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করা সহজ, বাড়ির কাছাকাছি বিদ্যালয় প্রায়ই থাকে ; কিন্তু আমাদের গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ের অভাব দেখা যায়। এমন সব জায়গা আছে, যেখানে ছোট ছেলে-মেয়েরা তিন-চার মাইল পথ হেঁটে বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে যায়। প্রতিটি গ্রামে একটি ক'রে বিদ্যালয় দরকার।

নিয়ম ক'রে শিশুবয়স থেকেই ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে শিক্ষার্থীদের বিছানা থেকে উঠতে শেখানো দরকার। তেমনি বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকাও উচিত নয়। স্বাস্থ্যের নিয়ম অনুযায়ী ঘুম থেকে ওঠা এবং ঘুমোতে যাওয়ার অভ্যাস করানো দরকার। ঘুম থেকে ওঠবার পর ভালো ক'রে মুখ-হাত-পা ধুয়ে ছোটদের সামান্য ব্যায়ামে অভ্যস্ত করানো দরকার। কিছু জলযোগ করিয়ে তাদের পড়াশুনাতে বসানো উচিত এবং ছেলে-মেয়েরা যখন লেখাপড়ায় রত, তখন অভিভাবকদের নজর রাখা উচিত। পিতা বা মাতা যদি একটু সময় ক'রে নিজের ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার দেখাশুনা করেন তবে তারা পড়াশুনাতে কখনও ব্যর্থ হয় না। কয়েকটা বছর যদি অভিভাবকেরা সকাল-সন্ধ্যা ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া নিজেরাই দেখাশুনা করেন, তাহলে তাদের লেখাপড়া করা একটা নিয়মে বা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তারা নিজেরাই স্বাধীনভাবে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারবে।

পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি বা সাজগোজের প্রতি ছেলে-মেয়েরা যেন পড়াশুনা বাদ দিয়ে আসক্ত না হয়ে পড়ে, সেদিকে নজর রাখা

দরকার। ছেলে বা মেয়ে প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু খেলাধুলা করা উচিত। প্রত্যহ ভালো ক'রে স্নান করলে যেমন দেহ পরিষ্কার ও শীতল হয়, তেমনি খেলাধুলা দেহকে শক্ত, সজীব ও সতেজ ক'রে তোলে। তা ছাড়া, খেলাধুলার প্রভাব মনের উপর বিস্তারলাভ করে। পাঁচজনের সঙ্গে খেললে পরস্পরের প্রতি প্রীতির বন্ধন গ'ড়ে ওঠে ও বন্ধুত্বের সূচনা হয়। সকলে মিলে একসঙ্গে কাজ করার যে ইচ্ছা, তা বন্ধুত্বের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়।

বিদ্যালয়ের ছুটির সময়ে, দেশের ইতিহাস-সম্পর্কিত দেশভ্রমণের বই, আমাদের দেশের মহাপুরুষগণের, দেশবরেণ্য নেতাদের জীবনী ও তাঁদের দেশপ্রীতির বিষয়ে লেখা বই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার ঘরে রাখা উচিত। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যে-সব বই ছোটদের জন্যে লেখা, সেগুলিও শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়া দরকার। এইসব বই পড়লে ছেলে-মেয়েরা নানা বিষয়ে জানতে পারে ও জানার আগ্রহ বাড়ে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 'নিজের কাজ নিজে করার' অভ্যাসটি শিক্ষা দেওয়া দরকার। 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর শিক্ষার্থীরা নিজেরা তাদের বিছানা পাতা বা তোলা, ঘর পরিষ্কার করা, খাবারের বাসনপত্র পরিষ্কার করা ও নিজেদের পোশাক পরিষ্কার করা ইত্যাদি কাজ নিজেরাই করে। নিয়ম ক'রে উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদন করতে সময় খুব বেশী লাগে না। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অলসতা কেটে যায়, তারা স্বাবলম্বী হয় ও পরবর্তী জীবনে কখনও তাদের পরমুখাপেক্ষী হতে হয় না।

পিতা-মাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা প্রতিটি শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য। কারণ, গুরুজন ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা সব সময়ই ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল চিন্তা করেন। শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের প্রতি অবজ্ঞা বা তাঁদের পড়ানোর সময়ে অমনোযোগী হলে, শিক্ষায় অনুরাগ জন্মায় না। তাই দেখা যায়, যে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক বা শিক্ষিকার প্রিয়, সে-ই ভালো লেখাপড়া শিখতে পারে এবং শ্রেণীর সেরা ছাত্র বা ছাত্রী হয়ে উঠতে পারে।

পরিবেশ

কোন জায়গার মাটি, জল, উদ্ভিদ্, পশুপাখী,—তার আবহাওয়া বা সে জায়গার বাতাস, তাপ, বৃষ্টি ও উষ্ণতা সব মিলিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তাকেই এক কথায় সেই জায়গার পরিবেশ বলা হয়। উদ্ভিদ্, প্রাণী ও প্রাণী-শ্রেষ্ঠ মানুষ এই ধরনের নানা জায়গার পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে বেঁচে থাকে। সব রকমের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে জীব নিজেদের সত্তা বজায় রাখে। তাই মানুষকে ভালোভাবে বাঁচতে হলে তার চারপাশের পরিবেশের বিষয় জানা দরকার। আলো, বাতাস, জল, মাটি—এরা জড় হলেও প্রত্যক্ষভাবে জীবকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এদের সাহায্য নিয়েই জীবের জীবনধারণ। তাই কোন জায়গার আলো, বাতাস, জল ও মাটি—এক কথায় সেই জায়গার প্রাকৃতিক পরিবেশ (Abiotic environment)। আবার এই প্রাকৃতিক পরিবেশে যে-সমস্ত সজীব জীবনধারণ ক'রে আছে—তারাও নিজেদের মধ্যে একটা সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। এই দ্বিতীয়প্রকার পরিবেশকে সজীবের পরিবেশ (Biotic environment) বলা হয়। নানারকমের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী এই সজীব পরিবেশের বাসিন্দা।

প্রাকৃতিক পরিবেশ (Abiotic Environment)

আলো, বাতাস, মাটি ও জল—এদের সমন্বয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। মা যেমন জন্মের পর আপন সন্তানকে একান্তভাবে লালন-পালন করেন, তেমনি প্রকৃতির আলো, বাতাস, মাটি ও জল জীবজগৎকে পালন করে। এরই মধ্যে আমরা সকলেই বসবাস করি। আমাদের দেহের ও মনের চাহিদা মেটাতে আমাদের সঙ্গে পরিবেশের উদ্ভিদ্ ও অন্য প্রাণীদের মধ্যে একটা একান্ত নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। এই সম্বন্ধ এমনই অটুট এবং এত দৃঢ় যে, মানুষ অন্যান্য উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে আলাদা রেখে নিজে বাঁচতে পারে না। এইভাবে উদ্ভিদ্, মানুষ ও অন্যান্য জীব

পরস্পরের সঙ্গে নির্ভরশীলতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং প্রকৃতির আলো, বাতাস, মাটি, জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিগুলি নিয়ে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে জীবন-নির্বাহ করে। আমরা সকল জীবই প্রকৃতির অধিবাসী। এর মধ্যে মানবজাতি সকল জীবের কেন্দ্রবিন্দু। তাই মানুষের চারপাশে ভিড় ক'রে থাকে অন্যান্য প্রাণিকুল ও উদ্ভিদ্। মানুষের খাদ্য প্রাণী ও উদ্ভিদ্। যুগ যুগ ধ'রে মানুষ উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের উন্নতিসাধনে ও প্রসারে ব্রতী।

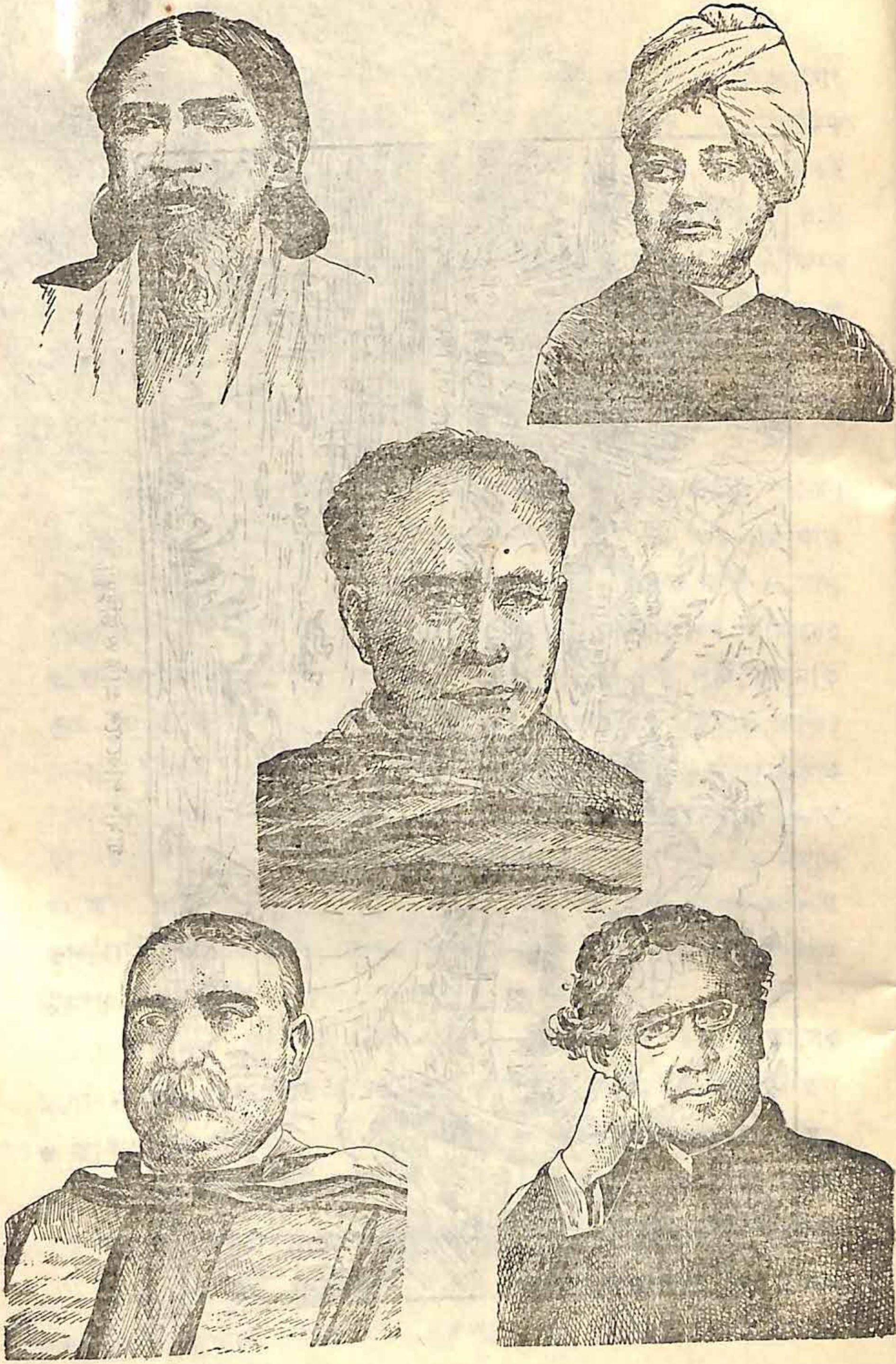
নিচে প্রকৃতির শক্তিগুলির মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশের কথা বলা হচ্ছে ঃ

আলো ঃ জীব শক্তি প্রায় সূর্যের আলো ও তার উত্তাপ থেকে। এই আলো ও উত্তাপ থেকে উদ্ভিদ্ তৈরি করে তার খাদ্য, আর এই খাদ্য মানুষ ও অন্যান্য জীব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে। তাই জল যেমন জীবের জীবন, তেমনি সূর্য আমাদের শক্তির আধার। উদ্ভিদের পাতায় শর্করা-তৈরি, দেহ-বৃদ্ধি, পুষ্টি, এমনকি ফুল, ফল ও বীজ ধারণের জন্যেও উত্তাপের প্রয়োজন। তেমনি প্রাণীর দেহের ভিতরকার যন্ত্রগুলির স্বাভাবিক কাজকর্মের জন্য এবং স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য দরকার সূর্যের আলো ও উত্তাপ। তাই বিদেশে 'সূর্যস্নান' বা 'সান-বাথ' এত প্রচলিত। মানুষের শরীরের তাপ সর্বঋতুতে সমান থাকে। তাই গরমকালে আমরা স্নান করি ও পাখার তলায় থাকতে ভালবাসি, আবার শীতকালে পশমের গরম জামা প'রে নিজেদের দেহের উত্তাপ বজায় রাখি।

বাতাস ঃ পৃথিবীর কোন স্থানই বাতাসহীন নয়। বাতাসের মধ্যে নানারকমের গ্যাস থাকে এবং তার মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রধান। অক্সিজেন জীবজগতের প্রাণ। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের শ্বাস-কার্যের জন্য অক্সিজেন একান্তভাবে দরকার। এই অক্সিজেন খাদ্য দহন ক'রে তা থেকে শক্তি বের করে। এই শক্তি ব্যবহার ক'রে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী তাদের শরীরকে সতেজ ও তাজা রাখে। উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে এর সঙ্গে জল মিশিয়ে সূর্যের আলো



গ্রামীণ পরিবেশে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ ।



বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট এঁরা আদর্শ-স্বরূপ।

উপরের সারি ঃ বাম দিক থেকে—শ্রীঅরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ ; মাঝখানে—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ;
নিচের সারি—স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

ও পাতার সবুজকণার সাহায্যে শর্করা তৈরি করে। শর্করা-জাতীয় খাদ্য বা শ্বেতসার খাদ্য হচ্ছে মূল খাদ্য। এ-থেকে পরে প্রোটিন, চর্বি ও তেল তৈরি হয়। তাই অক্সিজেনের মতো পরোক্ষভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রাণীদের প্রয়োজন। বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদের মূল খাদ্য-তৈরির প্রধান উপাদান। নাইট্রোজেন বাতাসের মধ্যে থাকায় তা মাটির মধ্যে মিশে নাইট্রেট তৈরি হয়। নাইট্রেট উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। এই সমগ্র কার্যটি বাতাসের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। তাই বাতাস আমাদের প্রাণ। গ্রামাঞ্চলের বাতাস অনেক পরিষ্কার এবং বাতাসের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী থাকে। খোলা জায়গাতে বাতাসের পরিমাণ বেশী থাকায়, মানুষের শ্বসন-ক্রিয়ার সুবিধে হয়। শহর ও নগরে প্রচুর কল-কারখানা থাকায়, বাতাস দূষিত হয়ে যায়। এই দূষিত বাতাস শ্বসনের মাধ্যমে ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ফুস্‌ফুসের কার্যকরী ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কল-কারখানার দূষিত ধোঁয়া এর জন্যে দায়ী। পশ্চিমবাংলার কল-কারখানা-পূর্ণ অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা দূষিত ধোঁয়া-বাতাস গ্রহণ ক'রে থাকেন।

জল : জল জীবের জীবন। তেমনি দূষিত জল মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়। পরিস্রুত জল রক্তের আধার। জলের জন্যে রক্ত এত তরল। রক্তের সরবরাহের জন্যই আমাদের দেহের প্রতিটি কোষ পায় তার খাদ্য, ভিটামিন, হরমোন ও তরল খনিজ-পদার্থ। শরীরের বৃদ্ধি, পুষ্টি, সজীবতা জলের জন্যই। নদীর জল, পুকুরের জল বা কুয়ার জল পরিস্রুত ক'রে পান করা দরকার। কারণ জলের মধ্যে নানাপ্রকারের মারাত্মক জীবাণু থাকে। এরা শরীরের মধ্যে ঢুকলে মৃত্যুর কারণ হয়। আমাদের ভাগীরথীর দু'পাশে প্রচুর কল-কারখানা আছে, আর আছে দু'ধারে অনেক শহর। কল-কারখানার দূষিত জল ভাগীরথীতে এসে জমা হয়। ঠিক তেমনি শহরগুলির নর্দমার জল ভাগীরথীর মধ্যে ফেলা হয়। ফলে ভাগীরথীর জল বিষাক্ত হয়ে যায়। বিষাক্ত জলের পরিবেশে মানুষের পরমায়ু বাড়তে পারে না। মানুষ রোগাক্রান্ত হয়।

জলজ পরিবেশের মধ্যে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী সকলেই বাস করে।

উদ্ভিদ্ তার অসংখ্য মূল দিয়ে জল শোষণ করে। জলের ভেতর দিয়ে উদ্ভিদ্ তার দেহের খাবার সরবরাহ করে। নারকেল, তাল, দেবদারু প্রভৃতি বড় বড় উদ্ভিদের দেহের সর্বত্রই জলের মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ হয়। এই জল মাটি থেকে মূলের দ্বারা উদ্ভিদ্ তুলে নিয়ে পাতায় পৌঁছে দেয়। সুতরাং জলের পরিবেশেই জীবের বিকাশ। প্রাণিদেহের দূষিত পদার্থ ঘাম ও প্রস্রাব হয়ে দেহ থেকে বের হয়ে আসে। ঘাম ও প্রস্রাব জলের মাধ্যমেই বের হয়। পরিপাক, পুষ্টি, রক্ত-চলাচল—প্রতিটি ক্ষেত্রে জলের পরিবেশ দরকার। প্রকৃতির জল-চক্র আমাদের এই জল সর্বদা সরবরাহ করছে।

মাটি : মাটির উপর উদ্ভিদ্ বা প্রাণীর বসতি নির্ভর করে। শুক্‌নো মাটিতে কোন গাছই জন্মাতে পারে না। তেমনি নোনা বা বালি-মাটিও চাষের অনুপযুক্ত। মাটির মধ্যে গাছপালার খাবার থাকে। তাই গাছের গোড়ায় ভালো ক'রে মাটি দিলে গাছ বড় হয়। আবার মাটির মধ্যে কেঁচো, কীট-পতঙ্গের লার্ভা ও পিঁপড়ে, উই প্রভৃতি বাস করে। এরা মাটি থেকে খাবার যোগাড় করে এবং মাটি উর্বর করে। মাটি ভালো হলে সে-জায়গায় উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সমাবেশ হয়। ফলে, সহজেই মানুষের বসতি গড়ে ওঠে।

প্রাণী ও উদ্ভিদে ভরা এই পৃথিবী। আকাশে, বাতাসে, গাছের ডালে-ডালে, মাটির মধ্যে—প্রায় সর্বত্রই কোন-না-কোন প্রাণী দেখা যায়। এমনকি বাড়ি-ঘরের মধ্যেও আরশোলা, টিকটিকি, ছারপোকা ও মশার বাস। আর, উদ্ভিদ্ কোথায় নেই? বেশী জল পড়লে শ্যাওলা জন্মায়। শ্যাওলা একরকমের উদ্ভিদ্। তাই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-ভরা এই পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা চেষ্টা করলে প্রকৃতির সব জীবের রহস্য জানতে পারে। প্রকৃতি তার কোন রহস্যই গোপন করে না। দেখবার মতো চোখ, শোনবার মতো কান ও বিজ্ঞানী-সুলভ মনোভাব তৈরি করতে পারলে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী-জীবনের সমস্ত জীবন-রহস্য জানতে পারা যায়।

সজীবের পরিবেশ (Biotic Environment)

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে আছে আর-এক পরিবেশ। সেটি সজীবের পরিবেশ। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী পৃথিবীর সর্বত্র

রয়েছে। জলে, মাটির ভেতরে, গাছের ডালে-ডালে, এমনকি বাতাসে উড়ে বেড়ায়, এমনও অনেক প্রাণী দেখা যায়। এরা মানুষের কোন-না-কোন উপকারে আসে। মানুষের খাদ্য এই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী যোগায়। তাই এদের জীবনধারা আমাদের জানা দরকার। কোন্ পরিবেশে কি কি ধরনের গাছ-পালা ও প্রাণী দেখা যায় তার একটি বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

1. **জলজ পরিবেশ** (Aquatic environment) ঃ জলের মধ্যে সজীবেরা একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে। গ্রামের পুকুরে বা দীঘিতে একটু নজর দিলেই এইসব সজীব পরিবেশের বাসিন্দাদের চেনা যায়। পুকুরের জলে সবুজ এককোষী উদ্ভিদ্, যেমন—ডেস্‌মিড, ডায়াটম ইত্যাদি বাস করে। আবার অসংখ্য কীট-পতঙ্গের লার্ভা, কপিপড, সাইক্লপ্‌স বা ডাফ্‌নিয়া ইত্যাদিকে পুকুরের জলে বাস করতে দেখা যায়। আবার পুকুরের ধারে নানারকমের সবুজ জলজ-উদ্ভিদ্‌ও দেখা যায়। এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে পাতায় শ্বেতসার তৈরি করে। পুকুরে ছোট চিংড়ি, জলের পোকা, জলের ফড়িং, মৌরলা মাছ, চাঁদা মাছ, ল্যাটা ও বেলে মাছও দেখা যায়। এরা সাইক্লপ্‌স ও ডাফ্‌নিয়া ইত্যাদি খেয়ে জীবনধারণ করে। বড় পুকুরে রুই, মিরগেল, কাতলা ইত্যাদি মাছও দেখা যায়। আবার এই জলেই কাছিম, জলজ সাপ ও শোল-জাতীয় মাছও দেখা যায়। শোল ও শাল মাছ অন্য মাছ খেয়ে জীবনধারণ করে। কাছিমও মাছ খায়। এইভাবে জলজ পরিবেশে সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদেরা একটি জীবগোষ্ঠী তৈরি করে।

2. **উভচর প্রাণীদের পরিবেশ** (Amphibious environment) ঃ জলেও বাস করে আবার স্থলেও বাস করে, এ-ধরনের উভচর প্রাণীদের একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়। ব্যাঙ জলে ডিম ছাড়ে—তার লার্ভা বা ব্যাঙাচি জলেই সবুজ শ্যাওলা খেয়ে বড় হয়। তারপর জলের ধারে ডাঙায় এসে চলাফেরা করে ও কীট-পতঙ্গ ধ'রে খায়। জলের সাপও জল ছেড়ে স্থলে ব্যাঙের পেছনে পেছনে এসে ব্যাঙ ধ'রে খায়। জলের শামুকও স্থলে এসে জলের ধারের ছোট ছোট

জলজ গাছপালার পাতার উপর বসে আর পাতা খায়। এরা ব্যাঙের মতো জলে ও স্থলে শ্বাসক্রিয়া করতে পারে।

3. **ভূ-নিম্নস্থ পরিবেশ** (Sub-soil environment): মাটির তলায়ও নানাপ্রকার প্রাণী দেখা যায়। কেঁচো খুবই সাধারণ অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এরা মাটি খেয়ে জীবনধারণ করে ও জমির নিচেকার মাটি জমির ওপরে তুলে দিয়ে চাষীদের চাষের উপকার করে। মাটিতে বেশী কেঁচো থাকলে গাছের গোড়া নষ্ট হয়ে যায়। এতে গাছ বাড়তে পারে না। মাটির ভেতরে গর্ত ক'রে বাস করে নানা ধরনের সাপ। নানাপ্রকারের পিঁপড়াকে মাটির মধ্যে থাকতে দেখা যায়।

4. **স্থলীয় পরিবেশ** (Land environment): স্থলে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সমাবেশ প্রচুর। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে প্রায়ই আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম ও লেবু গাছ দেখা যায়। গ্রামবাসীরা এসব গাছ মানুষের উপকারে লাগে জেনে প্রতি বাড়ির বাগানে রোপণ করে। পুকুরের ধারে কলা, নারকেল ও তাল গাছ দেখা যায়। মাঝে মাঝে সুপুরি গাছও দেখা যায়। রাস্তার ধারে বা ঝোপ-জঙ্গলে কাঁটা-গাছ, ফণিমনসা, পাথরকুচি গাছ দেখা যায়। উপকারী উদ্ভিদ্ হিসেবে চাষীরা ধান, গম, সরিষা চাষ করে। ক্ষেতে বিভিন্ন সময়ে এদের চাষ হয়। ছোট বাগান ক'রে সংসারের চাহিদা পূরণের জন্য অনেকে বেগুন, লঙ্কা, ঢেঁড়স, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি তরি-তরকারির চাষ করে। বাড়ির চারপাশে বেশী জমি থাকলে আলু, মুলো ও পেঁয়াজের চাষও দেখা যায়। বাড়ির সামনে বিভিন্ন ঋতুতে নানারকমের ফুলের গাছ দেখা যায়। বারোমাসের ফুল গাছ, যেমন—বেল, জুঁই, করবী, গন্ধরাজ ও জবা প্রায় সব জায়গায় দেখা যায়। শীতের সময়ে গাঁদা, রজনীগন্ধা, ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভিদ্ তার রকমারি বাহার নিয়ে বাড়ির বাগানের শোভা-বর্ধন করে। এ-ছাড়া পুকুরের জলে শালুক, পানা প্রায়ই দেখা যায়। জলা জায়গায় ফার্ন, কলমি, মেথি ও থানকুনি উদ্ভিদ্ আপনা-আপনিই জন্মায়। পচা গাছের গুঁড়িতে বা দেওয়ালে মস্-এর চক্‌চকে ভেলভেটের সবুজ রঙের বাহারও চোখে পড়ে।

মানুষের উপকারী প্রাণী বলতে গোরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, মুরগি ও হাঁস প্রধান। এরা সকলেই গৃহপালিত জীব। এদের উপর মানুষের জীবন বহুলাংশে নির্ভর করে। স্থলের এইসব প্রাণীরা মানুষের জীবন-যাত্রার সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে, দেখলে এদের বাড়ির একজন ব'লে মনে হয়। বেড়াল মানুষের উপকারে না লাগলেও পরোক্ষভাবে ইঁদুর মেরে গৃহস্থের উপকার করে। প্রায়ই মানুষের ঘরে বেড়াল দেখা যায়। নেংটি-ইঁদুর দোকান-ঘরে, গৃহস্থের রান্নাঘরে ও চাল-ডালের গুদামে থাকে। বড় ইঁদুর ধানক্ষেতে মাটিতে গর্ত ক'রে বাস করে। গুদাম-ঘরে আরশোলা প্রচুর দেখা যায়। কাগজ ও বই-ভরা আলমারির মধ্যেও আরশোলা দেখা যায়। সাপ প্রকৃতপক্ষে মাটির মধ্যে গর্ত ক'রে বাস করে; কিন্তু ব্যাঙ ইত্যাদি খাবারের সন্ধানে স্থলে ঘুরে বেড়ায়। পশ্চিমবাংলায় কেউটে, চন্দ্রবোড়া ও গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সাপ প্রচুর। মাটিতে গর্ত ক'রে শৃগালেরা বাস করে এবং রাতে এরা বের হয়। গৃহস্থের হাঁস-মুরগি এদের খাদ্য। ঘোড়া গ্রামে তেমন দেখা যায় না—শহরে ঘোড়া দেখা যায়, কিন্তু গাধা দেখা যায় সর্বত্র। এটিও গৃহপালিত এবং ধোপাদের ভারবাহী আপনজন। উপরোক্ত প্রাণীদের বিষয়ে প্রতিটি মানুষের ভালোভাবে জানা দরকার। এদের উপর মানুষের ভালোমন্দ অনেকটা নির্ভর করে। এরা যে কেবল আমাদের খাবার দেয় তা নয়, অর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যও মানুষ এদের কাছ থেকে পায়।

5. **খেচর পরিবেশ** (Aerial environment): আকাশে-বাতাসে অনেক প্রাণী উড়ে বেড়ায়, যেমন—চিল, শকুন, বা বাজপাখি। এরা আকাশে উড়ে বেড়ালেও স্থলের জিনিসই এদের খাদ্য। গোলা-পায়রা ও কাক গৃহস্থের বাড়ির ধারে-কাছে থাকে। এরা গৃহস্থ-বাড়ির পড়ে-থাকা বা ফেলে-দেওয়া খাবার বা শস্য খায়। গাছের ফল-খাওয়া পাখিও প্রচুর দেখা যায়; যেমন—টিয়া, চন্দনা, শালিক, চড়ুই, হলুদ-বসন্ত ও পাপিয়া। বড় তালগাছের পাতায় লম্বা লম্বা বাসা তৈরি ক'রে বাস করে বাবুই পাখী। মুক্ত আকাশে এরা ঘুরে বেড়ায় ও গাছের ফল ও ছোট পোকা খেয়ে বেঁচে থাকে। স্তন্যপায়ী বাদুড় নিশাচর ও

খেচর। দেবদারু গাছের ফল এদের প্রিয় খাদ্য। এরা আকাশে অনেক উঁচুতে বহুদূর পর্যন্ত দলবদ্ধভাবে উড়ে যেতে পারে। পাখি ব্যতীত পতঙ্গরা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। নানারঙের প্রজাপতি প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। ফুলে ফুলে মধু খেয়ে এরা ফুলের পরাগ-সংযোগে সাহায্য করে। মৌমাছিও প্রজাপতির মতো মধুর লোভে ফুলে ফুলে আপন চাহিদামতো ঘুরে বেড়ায়। এ-ছাড়া গঙ্গা-ফড়িং, জল-ফড়িং, বোলতা ও কুমোরে-পোকা ঘরে-বাইরে দেখা যায়। পঙ্গপাল পশ্চিমবঙ্গে খুব কম দেখা যায়। এরা হাজারে-হাজারে উড়ে এসে গম বা ধানক্ষেতের উপর ব'সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গাছের সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। নানারকমের মাছি ও মশা সর্বত্র দেখা যায়। এরা বনে-জঙ্গলে, গৃহস্থের বাড়ির ভেতরে ঘুরে বেড়ায় এবং নানা রোগের জীবাণু ছড়ায়।

শিক্ষার্থীর পরিবেশ

শহরের ও গ্রামের পরিবেশের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়া করে। শহরবাসী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া করার সুযোগ অনেক বেশী। সেখানে অনেক পাঠাগার থাকায় জ্ঞান-আহরণে বইয়ের অভাব হয় না। বড় বড় শহরে নানারকমের মিউজিয়াম, উদ্ভিদের বাগান, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি থাকায় জীবন-বিজ্ঞান-শিক্ষায় এগুলি প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। বিজ্ঞান-সম্পর্কে সভা-সমিতি বা আলোচনা প্রায়ই অনুষ্ঠিত হয় শহরের কোন-না-কোন প্রতিষ্ঠানে। সেখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা এর দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়। উপরোক্ত সুবিধা গ্রামাঞ্চলে তেমন নেই। আবার শহরে বা গ্রামে যেখানে কিছু জমি-জায়গা খোলা প'ড়ে থাকে, সেখানে নানা ধরনের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা এদের বিষয় পর্যবেক্ষণের সাহায্যে অনেক কিছুই জানতে পারে। ফুলের উপর ব'সে প্রজাপতি তার লম্বা প্রোবসিস্ দিয়ে কি সুন্দরভাবে ফুল থেকে কত সহজে মধু শোষণ করছে, তা স্বচক্ষে দেখা যায়। নানা শ্রেণীর উদ্ভিদের পাতা, ফুল বা তাদের গঠন সজীব অবস্থায় দেখা যায়। প্রাণীদের বাসা-তৈরির পদ্ধতি, তারা কি-ভাবে জীবনযাপন করছে,

বাচ্চাদের কি-ভাবে পালন করছে, কি-ভাবে খাবার নিয়ে এসে বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছে—এসব শহরের ধারে ঝোপ-ঝাড়ে ও গ্রামে দেখা যায়। প্রকৃতির এইসব বাসিন্দাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে এদের বিষয়ে শেখার সুবিধা তাই আধা-শহর ও গ্রামে বেশী। গ্রামে খোলা জায়গা বেশী থাকায় শিক্ষার্থীদের খেলাধুলো করার সুবিধে অনেক বেশী। শরীর-চর্চার জন্যে গ্রামে জায়গার অভাব নেই। বাতাসও অনেক পরিষ্কার। নগরে যেমন কল-কারখানা ও বাস-ট্রাকের ধোঁয়ায় বাতাস দূষিত ক'রে রাখে, তেমনটি গ্রামে হয় না। বিশুদ্ধ বাতাস-সেবনে শিক্ষার্থীর শরীর ও মন সতেজ হয়। গ্রামাঞ্চলে খোলা নালা-নর্দমা ও পচা পুকুর থাকে, তা ছাড়া আবর্জনা এখানে-সেখানে পড়ে থাকে। এর ফলে জল দূষিত হয় এবং কারো কোনো রোগ হলে তা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। কলের জল শহরে পাওয়া গেলেও, আজও গ্রামে তা বিরল। ফলে, জল-জনিত রোগে গ্রামের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায়ই আক্রান্ত হয়। এতে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ধী-শক্তি কমে যায়।

শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় ও গৃহের পরিবেশ

শিক্ষার্থী যেখানে বসবাস করে, তার পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ—এই দুটি পরিবেশের আওতার মধ্যেই প্রধানতঃ ছাত্র-ছাত্রীরা বসবাস করে। বাড়ির পরিবেশ শিক্ষার্থীর শিশুকাল থেকে জানা। সুতরাং বাড়ির পরিবেশের প্রভাব শিক্ষার্থীর জীবনে সর্বপ্রথমে বিস্তারলাভ ক'রে থাকে। অভিভাবক এবং আত্মীয়স্বজন শিক্ষার্থীদের সামনে সব সময়ে সতর্কভাবে কথা বলবেন—এটাই বাঞ্ছনীয়। বাড়ির আত্মীয়-স্বজনের কু-অভ্যাসগুলি ছোট ছেলে-মেয়েরা অনুকরণ করে এবং পরে তা তাদেরও স্বভাবে পরিণত হয়। তাই বাড়িতে শিক্ষার্থীদের একটু তফাতে রাখা দরকার। বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং সব জিনিস ঠিক জায়গায় রাখা থাকলে, ছোট বয়স থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই ধরনের পরিবেশের মধ্যে নিজেদের মানিয়ে নেয়।

শিক্ষার্থী যে পাড়ায় বাস করে, স্বভাবতঃই সেই পাড়ার সমবয়সী

ছেলেদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। অভিভাবকদের এইসব বন্ধুর প্রতি নজর রাখা উচিত। ভালো ছাত্র ও সৎ ছাত্র অসৎ-সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে গিয়েছে তার উদাহরণ বহু দেখা গিয়েছে। ছোট বয়সে কে সৎ বন্ধু বা কে অসৎ বন্ধু তা শিক্ষার্থীদের বিচার করার ক্ষমতা থাকে না। তাই অভিভাবকদের এ-বিষয়ে দেখা দরকার। তেমনি, বিদ্যালয়ে সব ছাত্রই ভালো ছাত্র—এমন হয় না। সুতরাং খারাপ ছাত্র বা পড়াশুনা করে না এমন ছাত্রদের সঙ্গে মিশেও বহু সরল ও মেধাবী ছাত্র নষ্ট হয়ে যায়। বিদ্যালয়ে এবং বাড়িতে শিক্ষার্থী যে পরিবেশে বসবাস করে এবং সে কানে যে-সমস্ত কথাবার্তা শোনে ও চোখে যে-সমস্ত দৃশ্য দেখে—সে-সবের মিলিত ছবি তার মনের মধ্যে থেকে যায় এবং সে সেইভাবেই পরবর্তী জীবন কাটাবার চেষ্টা করে। পরিবেশ ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন যেমন এক দিক থেকে গ'ড়ে তোলে, তেমনি আবার অন্য দিকে মন্দ পরিবেশ হলে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জীব ও জড়পদার্থের পরিচয়

জড় ও জীব চেনা এবং জানা—শুধুমাত্র বাড়িতে বসে বা শ্রেণীতে বসে কিছুই উপলব্ধি করা যায় না। জড়ের সমন্বয়ে জীবের আবির্ভাব। আবার জীবের বিলীনে জড়ের সৃষ্টি। জড়কে নিঃশেষে শোষণ ক'রে জীবের বৃদ্ধি। আবার জীবের মৃত্যুতে জড়ের আত্মপ্রকাশ। সুতরাং জড় ও জীবের মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম অথচ নিকটতম সম্বন্ধ রয়েছে যা মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়, অথচ বোঝা যায় না। জড় ও জীব এই পৃথিবীতে দুই প্রতিবেশীর মতো পরস্পর পাশাপাশি বাস করছে। এদের সম্বন্ধ এমনই যে, এক-কে না জেনে অপরের স্বরূপ চট্‌ ক'রে জানা যায় না। জীবন-বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান ক'রে দেখলেন যে, জীবকে বাদ দিয়ে যদিও-বা জড়ের পক্ষে থাকা সম্ভব হয়, জড়কে বাদ দিয়ে জীবের একটি মুহূর্তও চলে না। জড়ের কাঠামোর মধ্যেই জীবের জন্ম, জড়কে আত্মসাৎ ক'রেই

তার বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ এবং জড়ের মাধ্যমেই তার বৃদ্ধির বিকাশ। আবার মৃত্যুতে জড়েই তার পরিণতি।

জড় ও জীবের পার্থক্যের ধরন

জড় ও জীবে ভরা এই পৃথিবী। এক কথায় জীব কি এবং জীবের সংজ্ঞাই বা কি, তা বলা শক্ত। কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখে একটি বিশেষ বস্তু জীব না জড়, তা বোঝা যায়। এইরূপ বৈশিষ্ট্যগুলির বিকাশই জীবের জীবন। যদি তাই হয়, তাহলে জীবনের ধারাগুলিকে সজীব বস্তুর এক-একটি বৈশিষ্ট্য বললে 'জীবন' কথার অর্থ আরও পরিষ্কার হয়। এমন



১নং চিত্র—(ক) ভুট্টা, (খ) মুলা ও (গ) কলা উদ্ভিদের প্রতিটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার ও গঠন আছে।

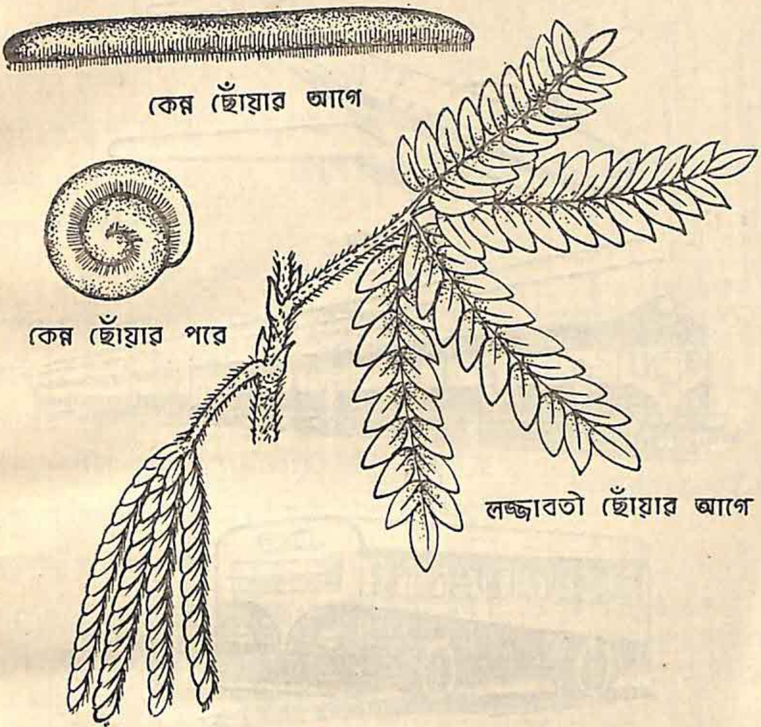
কতকগুলি পদার্থ আছে যাদের চেতনা নেই, নেই কোন স্পন্দন; যেমন—পাহাড়, পর্বত, নদীর জল, মাটি, নানারকমের ধাতু বা পাথর।

এদের স্পন্দন ও চেতনা না থাকায়, আমরা এসবকে বলি অচেতন পদার্থ বা জড় বস্তু। আবার এমন-সব বস্তু আছে যাদের চেতনা আছে, স্পন্দনও আছে, আছে বৃদ্ধিলাভের ক্ষমতা। এদের আমরা সচেতন পদার্থ বা জীব বলি ; যেমন—গাছপালা ও নানারকমের জন্তু-জানোয়ার। এমনকি মানুষও এই জীবের দলে। কেবল যে চেতনা থাকা আর না-থাকা নিয়েই এদের পার্থক্য, তা নয়। এই দুটি দলের মধ্যে আরো অনেক পার্থক্য আছে। আমাদের চারপাশে অসংখ্য বস্তুর সমাবেশ। বস্তুগুলির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে আমরা জড় ও জীবের পরিচয় অনেকটা পেতে পারি।

জবা গাছ সকলেই দেখে থাকবে ; অনেকের বাড়িতেই দেখা যায়। পাঁচটি পাপড়ি-বিশিষ্ট ফুল—আকারে ও গঠনে এক ; পাতা, কাণ্ড ও শাখা-বিন্যাসও প্রায় একই প্রকার। সব রকমের জবা গাছ আকারে ও গঠনে প্রায় সমান। সেইরকম তুলসী, বেল, জুঁই, অতসী, ফণিমনসা, কলা, ধান, মটর, করবী, নারকেল, সুপুরি, বট, রাস্না ইত্যাদি। একই প্রকারের সজীব বস্তুর আকার ও গঠন প্রায় এক। কত রকমের বা জাতের কুকুর এক-একটি পাড়ায় কত লোকের বাড়িতে থাকে। দেশী, অ্যাল্‌সেসিয়ান, গ্রে-হাউণ্ড, বুল-ডগ, ফক্স-টেরিয়ার ইত্যাদি নানা জাতের কুকুরের মধ্যে অনেকটা সমতা দেখতে পাওয়া যায়। গোরু, ছাগল, ভেড়া, কোকিল, শালিক, মাছ, কেঁচো বা কেন্নো—যে-কোন প্রাণী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এদের প্রত্যেকের নিজস্ব আকার ও গঠন প্রায় এক। কিন্তু একই জড়পদার্থে বিভিন্ন আকার দেখা যায়। যেমন—জল। তুষার, মেঘ, কুয়াশা, শিশির, জমাট বরফ বা বাষ্প—সবই জলের বিভিন্ন আকার বা রূপ। কিন্তু একের সঙ্গে অন্য কোনটিরই মিল নেই। জল—তরল ; বরফ—শক্ত, জমাট ও সাদা। **সুতরাং একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ কেবলমাত্র জড়পদার্থেরই বৈশিষ্ট্য, সজীবের নয়।**

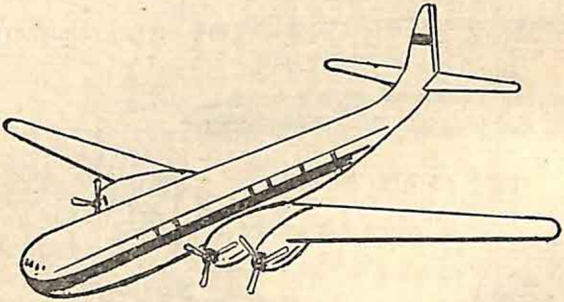
চলন-প্রক্রিয়া জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিদ্ তার দেহ মাটির সঙ্গে আটকে রাখে, কিন্তু এর শাখা-প্রশাখা নাড়া-চাড়া করতে পারে। লজ্জাবতী লতার পাতা স্পর্শ করলে তা সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। সূর্যমুখীর ফুল সূর্যের দিকে মুখ ক'রে থাকে। সন্ধ্যামণি সন্ধ্যেবেলায়

বিকশিত হয় ও দিনের বেলায় রোদে বন্ধ থাকে। স্থলপদ্মের ভোরবেলার রঙ সাদা, পরে সূর্যের আলোতে ফুলের সাদা রঙ লাল হয়ে যায়।

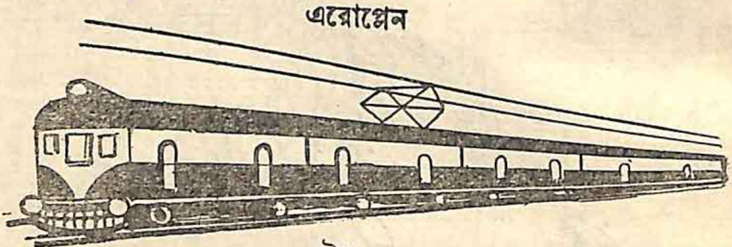


২নং চিত্র—কেন্নর গায়ে হাত দিলেই গুটিয়ে গোল হয়ে যায়, আবার লজ্জাবতীর খোলা পাতায় হাত দিলেই পাতাগুলি বন্ধ হয়ে যায়।

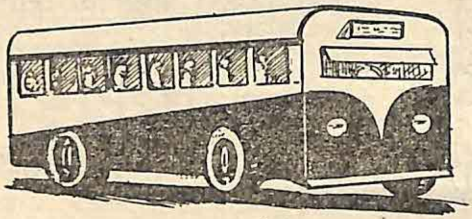
লাউ বা কুমড়োর আকর্ষগুলি, যেদিকে আলো, ঠিক সেইদিকেই এগিয়ে যায়। বীজ-বপনের পরে মাটির ভেতর থেকে কাণ্ড সোজা আলোর দিকে এগিয়ে যায় এবং মূল তার শাখা-প্রশাখা নিয়ে মাটির মধ্যে প্রবেশ করে। প্রাণী তার সমস্ত দেহ নিয়ে চলাফেরা করে। খাদ্য-অন্বেষণ এবং নিরাপদ আশ্রয় এই দুটির জন্যই প্রাণীরা চলাফেরা করে। পাখি তার সমস্ত দেহ নিয়ে আকাশে ওড়ে। কুকুর খাবারের সন্ধানে চলাফেরা করে। প্রাণী তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গও নাড়াচাড়া



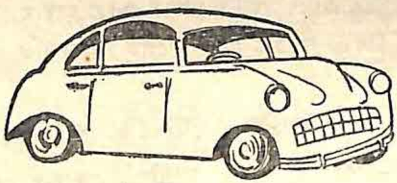
এরোপ্লেন



ট্রেন



বাস



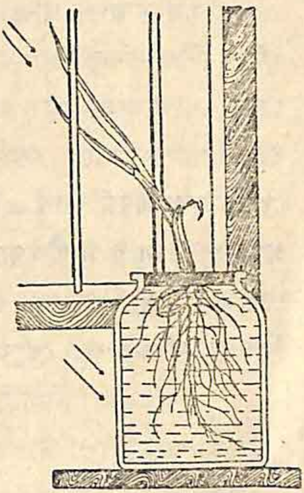
ট্যাক্সি

৩নং চিত্র—জড়পদার্থ, তবুও এগুলি দ্রুতগতিতে চলে।

এগুলি নিজেরা জড়-বিশেষ। মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে এদের কৃত্রিম উপায়ে দ্রুতগতিতে চালনা করে। প্লেন, বাস ও ট্যাক্সির ইঞ্জিন পেট্রোলের সাহায্যে চলে; ইলেকট্রিকের সাহায্যে চলে ট্রেন ও ট্রাম।

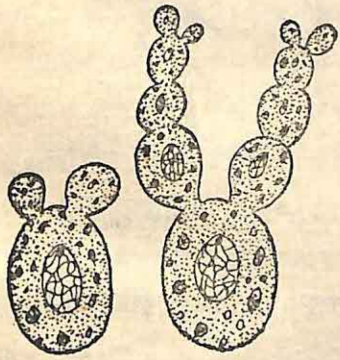
করতে পারে সহজে। কুকুর লেজ নাড়ে, মুখ ঘোরায়। জড়পদার্থের কোন চলন নেই। বালির পাহাড় বাতাসের তাড়নায় এক জায়গা হতে অপর জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছে—এমনও দেখা গেছে; কিন্তু তা বালুকণার চলন-প্রক্রিয়ার বলে নয়। দেহের ভেতর থেকে পেশী-সঞ্চালনে যে চলন-প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাকেই চলন-ক্রিয়া বলে। সুতরাং জড়পদার্থ-মাত্রই চলৎ-শক্তিহীন।

জীব খাদ্যকে তরল বা কঠিন অবস্থায় গ্রহণ করে এবং তা পরিপাক ক'রে দেহ পুষ্ট করে। ফলে, আকারে বড় হয়। এই বৃদ্ধি দেহের ভেতর হতে সৃষ্টি হয়। বাতাসে উড়ে, বালি কোন কোন জায়গায় জমা হয় ও উঁচু ঢিবির সৃষ্টি করে। কলকাতার কাছে ধাপায় জঞ্জাল ফেলে ফেলে বিরাট জঞ্জালের পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এগুলি বৃদ্ধি নয়। **বৃদ্ধি দেহের ভেতর থেকে সংঘটিত হয় এবং তা শুধু জীবের মধ্যেই দেখা যায়।**



৪নং চিত্র—গাছের ডাল আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের আলোর গতি তীর দিয়ে দেখানো হয়েছে।

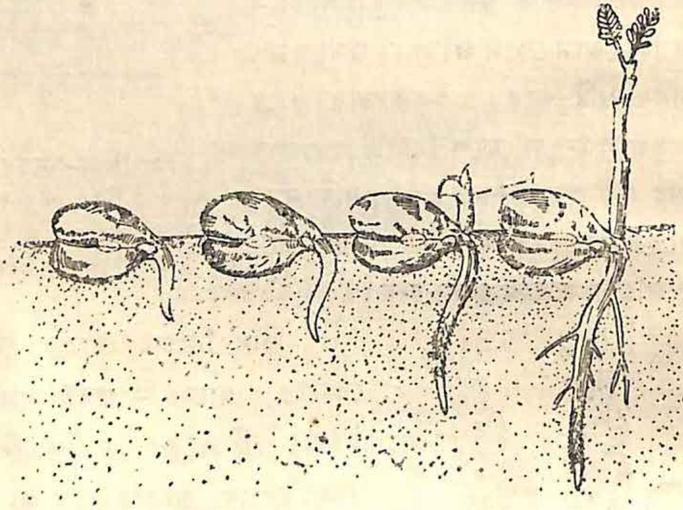
জীব নিজের দেহের ভেতরের কোষের সাহায্যে নিজেরই মতো নতুন জীবের সৃষ্টি করে। কুকুর বা বিড়ালের বাচ্চা জন্মায়, আবার হাঁস বা মুরগির ডিম থেকেও বাচ্চা জন্মায়। উদ্ভিদের বীজ থেকে চারা-গাছ বের হয়, পরে চারা-গাছ বড় হয়ে আবার বীজ ধারণ করে। কুকুর বা বিড়াল-বাচ্চা জন্মাবার সময়ে খুব ছোট থাকে। পরে খাদ্য খেয়ে নিজেদের দেহের আকার বৃদ্ধি করে।



৫নং চিত্র—ঈস্ট উদ্ভিদের দেহের ভেতর থেকে এক-একটি ক'রে উদ্ভিদের সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু কোন জড়বস্তু থেকে এ-ধরনের ছোট জড়বস্তু জন্মলাভ করে না। বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা জীবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। জড়ের সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই।

সজীব বস্তুর বৃদ্ধি দেখা যায়। একটি মটরের বীজ ভেজা-মাটিতে পুঁতে দিলে, কিছুদিন পরে সেটা থেকে চারা-মটরগাছ বেরিয়ে আসবে। চারা থেকে মূল, কাণ্ড ও পাতা বেরুবে। তারও কিছুদিন পরে গাছ বড় হয়ে গেলে, তাতে ফুল ধরবে ও পরে ফল ধরবে। মটরগাছের বীজ থেকে ফুল ধরা পর্যন্ত এই যে বৃদ্ধি, সেটা মটরগাছের ভেতর থেকেই হয়। গাছ বাতাস ও মাটি থেকে তার খাবার নিয়ে নিজের দেহকে বাড়িয়ে তোলে। প্রাণিজগতেও এই একই প্রণালীতে বৃদ্ধি দেখা যায়। শিশু-বিড়াল মায়ের দুধ খেয়ে ধীরে ধীরে বড় হয়। যখন সে হাঁটতে শেখে



৬নং চিত্র—ছোলা-বীজের ভেতর থেকে পুরো ছোলা-উদ্ভিদ্ বেরিয়ে আসছে। ১, নতুন মুকুলকে বীজ থেকে বেরোতে দেখা যাচ্ছে।

তখন সে নিজেই খাদ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং **বৃদ্ধি সজীবের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।**

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ অনুযায়ী আমরা বস্তুকে সজীব বলি। যেমন—**চলাফেরা করা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, খাদ্য সংগ্রহ করা** বা খাদ্য

হজম করা। এইসব কাজ করতে হলে জীবের শক্তির দরকার। এই শক্তি সজীব বস্তু পায় খাদ্য গ্রহণ ক'রে। বীজ ভেজা-মাটিতে প্রথমে মূল বের করে। পরে বীজপত্র বের হয়। মূল মাটিতে খাদ্য-মিশ্রিত জল শোষণ করে, আর বাতাস থেকে পাতা কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নিজেই জলের সঙ্গে তা মিশিয়ে চিনি-জাতীয় খাবার তৈরি করে। প্রাণী খাদ্য না পেলে বাঁচতে পারে না। খাঁচার পাখিকে খেতে না দিলে সে অল্পদিনের মধ্যে ম'রে যাবে। তাই প্রতিটি প্রাণীর নিয়মিত খাবার দরকার। টবের গাছে জল না দিলে, গাছ শুকিয়ে ম'রে যায়। সুতরাং জীবদেহে শক্তি যোগাবার জন্যই জীবের খাদ্য গ্রহণ করা দরকার। জড়বস্তু চলাফেরা, শ্বাসক্রিয়া বা অন্য কোন কাজ করে না। তাই এদের শক্তির দরকার নেই। সুতরাং খাদ্য-গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না।

জীবের নিশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রক্রিয়াকে একসঙ্গে শ্বাসক্রিয়া বলে। জীব বাতাস থেকে অক্সিজেন দেহের ভেতর টেনে নেয়। এই অক্সিজেন দেহমধ্যস্থ খাদ্যকে দহন করে। একে দহন-ক্রিয়া বলা হয়। এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্য থেকে শক্তি বের হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও বের হয়। শক্তি ব্যবহার ক'রে জীব চলাফেরা, খাদ্য-হজম, বৃদ্ধি প্রভৃতি সজীবের বৈশিষ্ট্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলে। কার্বন ডাই-অক্সাইড দেহকে নষ্ট করে, তাই প্রাণী বা উদ্ভিদ্ তা দেহ থেকে বাইরে বের ক'রে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে এক কথায় শ্বাসক্রিয়া বলা হয়। উদ্ভিদ্ও এই একই ভাবে পাতার অসংখ্য রন্ধ্র দিয়ে অক্সিজেন শোষণ করে এবং একই রন্ধ্র দিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের ক'রে দেয়। জড়বস্তুর শক্তির প্রয়োজন নেই। তাদের সজীবতার কোন লক্ষণ নেই। ফলে একইরকম শ্বাসকার্য হয় না।

প্রতিটি জীবের আয়ু সীমাবদ্ধ ও মৃত্যু অবধারিত। বিড়ালের বাচ্চা হয়। বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হয়। বড় হয়ে তারও বাচ্চা হয়। আরও বড় হয়ে বুড়ো হয়ে যায়; পরে একদিন ম'রে যায়। মানুষের বেলায়ও এই একই পরিণতি। উদ্ভিদ্ও তেমনি বীজ থেকে বের হয়ে বড় হয়। উদ্ভিদ্ বড় হলে ডালপালায় ফুল হয়। ফুল থেকে ফল এবং তা থেকে বীজ হয়। ফল শুকিয়ে গেলে, তার বীজ মাটিতে পড়ে,

আর গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে ম'রে যায়। সুতরাং জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জড়বস্তু, যেমন—ইট, পাথর বা সোনার বেলায় বৃদ্ধি, বংশবিস্তার বা শ্বাসকার্য নেই—তেমনি এদের মৃত্যুও নেই। জড়বস্তুর কোন অবস্থাগত পরিবর্তন বা পরিণতি নেই।

জড় ও জীবের মধ্যে প্রভেদ

জীব	জড়
১। প্রতিটি জীবের আকার ও গঠন প্রায় একই প্রকার।	১। জড়ের কোন আকার নেই।
২। জীবের দেহ—কোষ দ্বারা গঠিত। প্রতিটি কোষেই সজীব প্রোটোপ্লাজম বিদ্যমান। প্রোটোপ্লাজমের কার্য-কলাপই জীবের জীবন।	২। সজীব প্রোটোপ্লাজম জড়পদার্থে দেখা যায় না।
৩। পুষ্টিসাধন, শ্বসন, রেচন প্রভৃতি প্রণালী দ্বারা জীব তার নিজ দেহের বিপাকীয় কার্যগুলি সম্পাদন করে।	৩। কোষবিহীন জড়পদার্থে এইরূপ দেখা যায় না।
৪। জীব খাদ্য গ্রহণ ক'রে দেহ পরি-পোষণ করে।	৪। পরিপোষণ ব'লে জড়ের কিছু নেই।
৫। শ্বসন-প্রণালী দ্বারা খাদ্যসার হতে জীব শক্তি নির্গত করে।	৫। জড়ের শ্বাস-প্রণালী নেই।
৬। রেচন-প্রক্রিয়া দ্বারা জীব-দেহের ভেতর হতে দূষিত ও অনাবশ্যক দ্রব্য বের হয়ে আসে।	৬। জড়-দেহের অনাবশ্যক বা দূষিত ব'লে কিছু নেই।
৭। প্রোটোপ্লাজমের বৃদ্ধিতেই জীব-দেহের বৃদ্ধি হয়।	৭। বাইরে থেকে প্রাকৃতিক উপায়ে জড় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
৮। জীব বাইরের আঘাতে ও বিবিধ উত্তেজনায় সাড়া দেয়।	৮। উত্তেজনায় বা আঘাতে সাড়া দেবার ক্ষমতা জড়ের নেই।
৯। বংশবৃদ্ধি জীবের বৈশিষ্ট্য।	৯। জড়ের বংশবৃদ্ধি নেই।
১০। চলন জীবের ধর্ম।	১০। জড়ের চলন-প্রক্রিয়া নেই।
১১। জীবের জন্ম ও মৃত্যু আছে।	১১। জড়ের জন্ম ও মৃত্যু নেই।
১২। জীবের জীবন জীবনচক্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ।	১২। জড়ের জীবনচক্র পরিলক্ষিত হয় না।

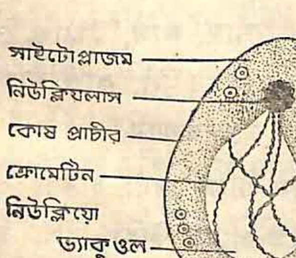
পরিবেশে উদ্ভিদ্ ও প্রাণী

উদ্ভিদ্

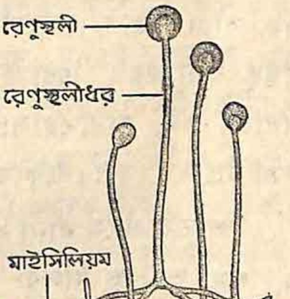
আমাদের চারপাশে নানারকমের উদ্ভিদ্ ও প্রাণী দেখা যায়। খুব নিচু শ্রেণীর উদ্ভিদে ফুল ধরে না। এদের **অপুষ্পক** উদ্ভিদ্ বলা হয়। শ্যাওলা, ছাতা, মস্ ও ফার্ন—অপুষ্পক উদ্ভিদের উদাহরণ। শ্যাওলা স্নানের ঘরে, পুকুরে ও দেওয়ালে প্রায়ই দেখা যায়। সবুজ চুলের মতো লম্বা গঠন এদের। লেবু ও পাউরুটি পচে গেলে, তাদের উপর ছাতা জন্মায়। লেবু বা পাউরুটির ছাতা তুলোর মতো সাদা দেখতে। আবার বর্ষাকালে গোবরের উপর ও পচা কাঠের উপর একরকমের ছাতা জন্মায়। গ্রামে এই ধরনের ছাতাকে 'ব্যাঙের ছাতা' বলে। এটিও একরকমের অপুষ্পক উদ্ভিদ্। সাদা, বড় ছাতা খাদ্য হিসেবে অনেকে খায়। **মস্** দেখতে সবুজ। সাধারণতঃ দেওয়ালের গায়ে ভেল্‌ভেটের মতো দেখতে সবুজ রঙের উদ্ভিদের সমাবেশগুলিই মস্। মসের কাণ্ড ও পাতা থাকে। ছোট হলেও, চোখে



৭নং চিত্র



৮নং চিত্র



৯নং চিত্র

দেখা যায়। ঘেঁটু শাক বা ফার্ন বেশ বড়। মসের মতো এটিও অপুষ্পক উদ্ভিদ্। বাগানে, পোড়ো বাড়ির ধারে বা ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গলে ফার্ন জন্মায়। মসের কাণ্ডের নিচের তলা থেকে সরু সরু শুঁয়ো বের হয়। এরাই মূলের কাজ করে। মসের চেয়ে ফার্ন আকারে অনেক বড় এবং এদের কাণ্ডের শাখা দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি গ্রামেই



মস্
১০নং চিত্র

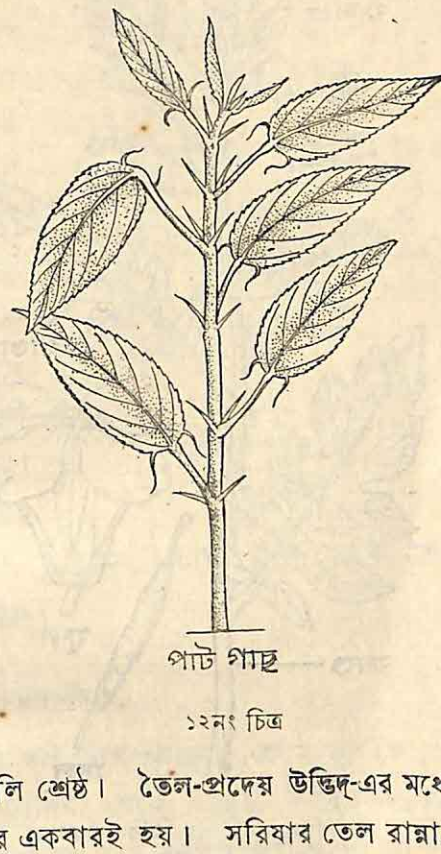


ফার্ন
১১নং চিত্র

ছাতা, মস্ ও ফার্ন উদ্ভিদ্ দেখা যায়। আর একধরনের উদ্ভিদ্ দেখা যায়, যারা বছরে একবার ক'রে ফুল ধারণ করে। এদের **সপুষ্পক** উদ্ভিদ্ বলা হয়। এরা উঁচু শ্রেণীর উদ্ভিদ্। আম, জাম, কাঁঠাল, লেবু, পেয়ারা, গম, ধান, ছোলা—এর উদাহরণ। এদের মূল, কাণ্ড, শাখা ও পাতা থাকে। ফুল থেকে ফল, আর তা থেকে বীজ জন্মায়।

প্রতিটি গ্রামে নানা ধরনের **শস্য-প্রদেয়** উদ্ভিদ্ দেখা যায়। ধান, যব, গম, ভুট্টা ও বাজরা উদ্ভিদ্‌গুলিকে শস্য-প্রদেয় উদ্ভিদ্ বলা হয়। এরা এক-ঋতুর গাছ। মানুষের প্রধান খাদ্য চাল, গম ইত্যাদি এরাই যোগায়। আবার ছোলা, মটর ও কলাই উদ্ভিদ্ আমাদের ডাল-জাতীয় খাদ্য সরবরাহ করে। **সুতা-প্রদেয়** উদ্ভিদ্, যেমন—পাট, শিমুল ও কার্পাস

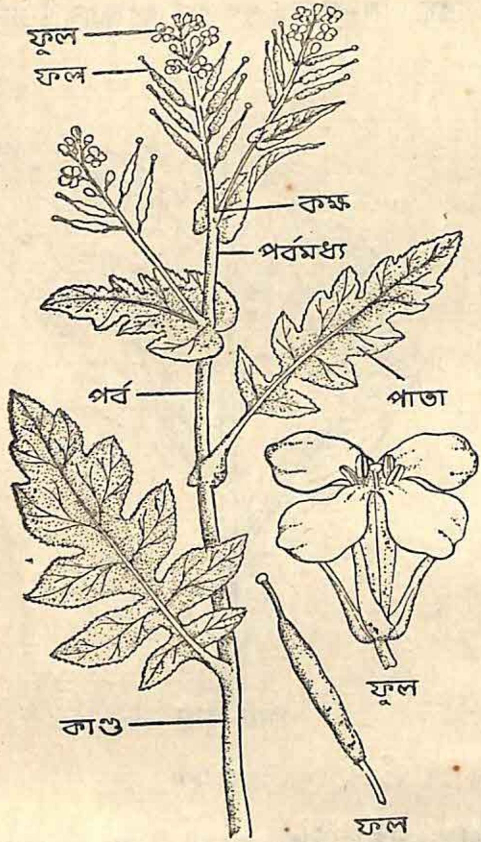
উদ্ভিদ্ গ্রামে-গঞ্জে প্রায়ই দেখা যায়। পাট এক-ঋতুর উদ্ভিদ্, কিন্তু শিমুল ও কার্পাস বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ্। শিমুলগাছ খুব বড় এবং একটি-দুটির বেশী দেখা যায় না। শিমুল ও কার্পাসের তুলো থেকে নানা ধরনের কাপড়, এবং পাট থেকে থলি, কার্পেট ইত্যাদি তৈরি হয়। কাষ্ঠ-প্রদেয় উদ্ভিদ্ প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। গ্রামে নরম কাঠের উদ্ভিদ্, যেমন—আম, জাম, কাঁঠাল দেখা যায়। এর মধ্যে কাঁঠাল-কাঠে দরজা-জানালার পাল্লা তৈরি হয়। নিমগাছের কাঠও উপকারী। দেবদারু-গাছের কাঠ দেশলাই-বাক্স তৈরি করতে লাগে। উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি ও অন্যান্য জায়গায় শাল ও সেগুন গাছ প্রচুর দেখা যায়। কাঠ হিসেবে এগুলি শ্রেষ্ঠ। তৈল-প্রদেয় উদ্ভিদ্-এর মধ্যে সরিষা প্রধান। এর চাষ বছরে একবারই হয়। সরিষার তেল রান্নার উপকরণ। নারকেল উদ্ভিদ্ প্রধানতঃ দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনায় প্রচুর দেখা যায়। তেল ছাড়া, এর ছোবড়া দিয়েও প্রচুর অর্থকরী জিনিসপত্র তৈরি হয়। রেড়ি, তিল ও বাদাম উদ্ভিদ্ থেকে অর্থকরী ও উপকারী তেল পাওয়া যায়। আনাজ বা তরি-তরকারি-প্রদেয় উদ্ভিদ্ গ্রামে প্রচুর পরিমাণে চাষ হয়। আলু, লঙ্কা ও পেঁয়াজ চাষীদের অর্থকরী উদ্ভিদ্। এ-ছাড়া লাউ, কুমড়ো, বেগুন, ঢেঁড়স, পটল, কপি ইত্যাদি বিভিন্ন ঋতুতে চাষীরা চাষ ক'রে থাকে। এগুলি চাষীরা নিজেদের সংসারে লাগায়, এবং কিছু অংশ বাজারে বিক্রি করে। অর্থকরী উদ্ভিদের মধ্যে পান,



পাট গাছ

১২নং চিত্র

চা, পাট ও আখ উদ্ভিদের নাম করা যায়। উত্তরবঙ্গে প্রচুর চা-বাগান দেখা যায়; তেমনি হাওড়া, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় পানের বরজ দেখা যায়। ঔষধ-প্রদেয় উদ্ভিদ্‌, যেমন—সিনকোনা, বেলেডোনা, নিম, আকন্দ, ধুতুরা, তুলসী, সর্পগন্ধা, থানকুনি, পেঁপে, যোয়ান প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌। সিনকোনা ও বেলেডোনা উত্তরবঙ্গে চাষ হয়। সর্পগন্ধাও পাহাড় অঞ্চলে শুষ্ক জমিতে চাষ করা হয়। নিম, আকন্দ, ধুতুরা, তুলসী, থানকুনি ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব জায়গায় পাওয়া যায়। নানারকমের রোগের ঔষধ হিসেবে এই উদ্ভিদ্‌গুলির বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়।



১৩নং চিত্র—সরিষার বিবিধ অঞ্চল।

ফল-প্রদেয় উদ্ভিদ্‌, যেমন—আম, জাম, পেয়ারা, পেঁপে, লেবু, কাঁঠাল ইত্যাদি। এইসব উদ্ভিদ্‌ পশ্চিমবঙ্গে অল্প-বিস্তর সর্বত্র দেখা যায়। ফল হিসেবে যেমন বেলগাছের ফলের নাম করা যায়, তেমনি অনেক রোগেরও ওষুধ হিসেবে এর ব্যবহার হয়। আনারস ফল হিসেবে যেমন উপকারী, এর পাতার রস কৃমি-জাতীয় রোগের ওষুধ। ত্রিপুরায় আনারসের চাষ খুব বেশী হয়। তেমনি এখন লিচু চব্বিশ-পরগনার সোনারপুর অঞ্চলে পাওয়া যায়। মালদা, মুরশিদাবাদ ও হুগলি অঞ্চল নানা জাতের আমের জন্য প্রসিদ্ধ। **ফুল-প্রদেয় উদ্ভিদ্‌**, যেমন—গাঁদা, জুঁই, চামেলী, বেল, রজনীগন্ধা, করবী,

রঙ্গন, গন্ধরাজ, জবা, চাঁপা, গোলাপ, কৃষ্ণকলি ইত্যাদি উদ্ভিদ্ শুধু ফুলের জন্যই খ্যাত। এগুলি শহরে বা গ্রামে সর্বত্র দেখা যায়। ব্যবসার ভিত্তিতে রজনীগন্ধা, গাঁদা ও গোলাপের চাষ পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া ও দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা অঞ্চলে ব্যাপকভাবে হয়। ডালিয়া ও চন্দ্রমল্লিকা উদ্ভিদ্ ফুলের দিক থেকে সেরা। শীতকালে ফুল-বিলাসীরা এগুলি খুব যত্ন ক'রে টবে লাগিয়ে ফুল ফোটান। আর দুটি গাছের নাম এখানে করা দরকার। প্রথমটি আখ। মানুষ আখ থেকে শর্করা পায়। দ্বিতীয়টি বাঁশ। মানুষের সভ্যতা বাঁশ থেকে তৈরী কাগজের উপর অনেকটা নির্ভরশীল।



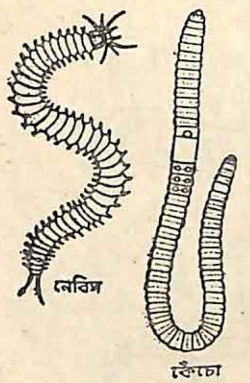
ধুতুরা গাছ

১৪নং চিত্র

প্রাণী

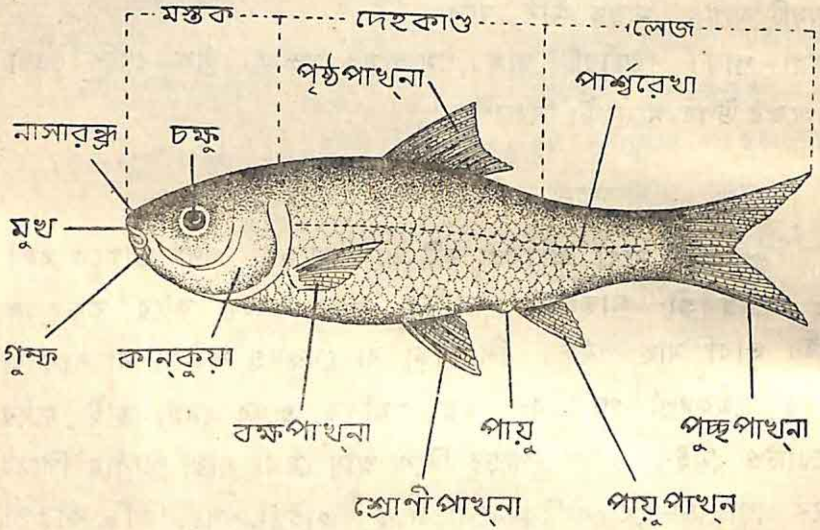
প্রাণীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগকে বলা হয় **অমেরুদণ্ডী**—আদ্যপ্রাণী অ্যামিবা থেকে আরম্ভ ক'রে কণ্টকত্বক্ পর্বের তারা মাছ পর্যন্ত। শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড শরীরে না থাকায়, এদের অমেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। মস্তিষ্ক এদের নেই, তাই এদের করোটিও নেই। এদের পেটের দিকে স্নায়ু দেখা যায়, আবার পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে পৌষ্টিক-নালী থাকে। হাইড্রা, স্পঞ্জ, চিংড়ি, কাঁকড়া, আরশোলা, কাঁকড়া-বিছা, তেঁতুলে-বিছা, মশা, মাছি, শামুক, ঝিনুক, কেঁচো ও তারা মাছ—এরা সবই অমেরুদণ্ডী প্রাণী। যে-সমস্ত প্রাণীর পিঠের দিকে লম্বালম্বিভাবে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড থাকে, তাদের মেরুদণ্ডী প্রাণী বলা হয়। করোটি বা মাথার খুলির মধ্যে এদের মস্তিষ্ক আবদ্ধ থাকে। হাড়ের একটা কাঠামো বা কঙ্কাল এদের দেহের আকার দেয়। পেটের

দিকে এদের পৌষ্টিক-নালী থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সাধারণতঃ একজোড়া হাত আর একজোড়া পা থাকে। ব্যাঙ, গিরগিটি, পায়রা, গিনিপিগ, বাঘ, গোরু, ছাগল ইত্যাদি প্রাণীরা মেরুদণ্ডী। মাছও মেরুদণ্ডী প্রাণী, তেমনি সমুদ্রের হাঙ্গরও।



১৫নং চিত্র—অঙ্গুরীমাল পর্বের প্রাণী।

জলজ প্রাণীদের মধ্যে মাছ পুকুরে, দীঘিতে ও নদী-সমুদ্রে প্রচুর পাওয়া যায়। পুকুরের রুই, কাতলা, বাটা, কই, মাগুর প্রভৃতি মাছ মানুষের প্রধান প্রোটিন-যুক্ত খাদ্য। পুকুরের কাছিম ও নদী-পাড়ের কাঁকড়াও মানুষের খাদ্য। পুকুরে পদ্মফুলের মধ্যে পদ্ম-গোখুরা নামে বিষাক্ত সাপ দেখা যায়। এটি মারাত্মক। পুকুরের ঢোঁড়া সাপ ছোট ছোট



১৬নং চিত্র—রুই মাছের বহিরাকৃতি।

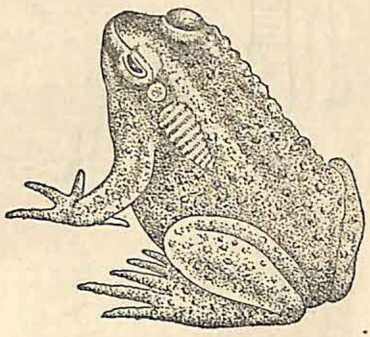
মাছ খেয়ে ফেলে মানুষের প্রধান খাদ্যের ক্ষতি করে। হাঙ্গর মাছ-জাতীয়। এদের বাস সমুদ্রে। এদের যকৃৎ থেকে মানুষের পক্ষে উপকারী তেল পাওয়া যায়। স্তন্যপায়ী তিমিও সমুদ্রের জীব। এদের দেহের চর্বি থেকে নানারকমের সামগ্রী তৈরি হয়। সব সামুদ্রিক সাপ-ই

বিষাক্ত। পুকুরের শামুক ও ছোট ছোট চিংড়ি মানুষের খাদ্য। গরীব চাষীরা মাছের বদলে শামুকের ও ঝিনুকের মাংসও খাদ্য-হিসেবে গ্রহণ করে।

উভচর প্রাণীদের মধ্যে ব্যাঙ-ই আদর্শ উদাহরণ। এদের জীবন-চক্রের শৈশব অবস্থা জলে কাটে, পরে পূর্ণাঙ্গ হয়ে এরা স্থলে ঘুরে বেড়ায়। এদের লার্ভা বা ব্যাঙাচি মাছের মতো জলে বাস করে ও জলেই



১৭নং চিত্র—সোনা-ব্যাঙ।

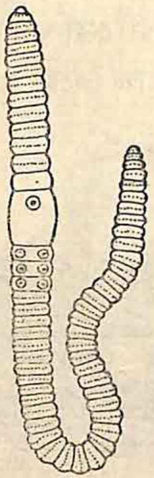


১৮নং চিত্র—কুনো-ব্যাঙ।

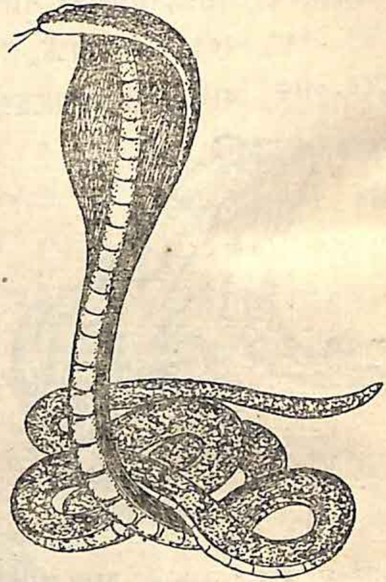
শ্বাসক্রিয়া সম্পন্ন করে। ব্যাঙ স্থলের নালা ও খানার মশা খেয়ে ফেলে। এ-ছাড়া অপকারী পোকামাকড় খেয়ে মানুষের উপকার করে। শামুকও উভচর প্রাণী। এরা জলেও থাকে, আবার স্থলে উঠে এসে, গাছের তরি-তরকারি ও উদ্ভিদের পাতা খেয়ে ফেলে। শামুক মানুষের খাদ্য হলেও, উদ্ভিদের ক্ষতি করে। সোনা-ব্যাঙ অনেকে খায়। কুনো-ব্যাঙের চেয়ে এরা আকারে বড় এবং পেশীবহুল। কুনো-ব্যাঙ অখাদ্য, কিন্তু সোনা-ব্যাঙের মাংস উপকারী।

ভূ-নিম্নস্থ প্রাণীদের মধ্যে প্রথমেই কেঁচোর কথা মনে পড়ে। কেঁচো মাটি খায় ও মাটি উলটে-পালটে লাঙলের কাজ করে। মাটি হালকা ও বায়ুপূর্ণ হয়। তাই কেঁচো মানুষের উপকারী প্রাণী। মাটির ভেতর অনেকরকমের পিঁপড়া বাস করে। এরা উদ্ভিদের ক্ষতি ক'রে পরোক্ষভাবে মানুষের ক্ষতি করে। মাটিতে গর্ত ক'রেই সাপ বাসা

বাঁধে। গ্রামে-গঞ্জে গোখুরা, কেউটে, চন্দ্রবোড়া প্রভৃতি সাপ দেখা যায়। প্রতিবছর বহু মানুষ এদের কামড়ে মারা যায়। বিষাক্ত সাপের বিষ ওষুধ হিসেবে কিছু রোগে ব্যবহৃত হয়। মশা ব্যাঙের প্রিয় খাদ্য,



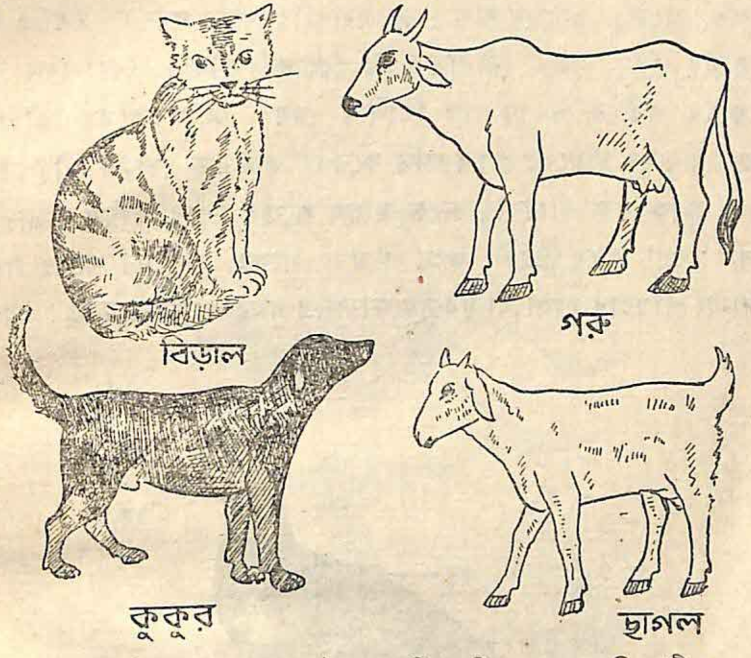
১৯নং চিত্র—কেঁচোর বহিরাকৃতি।



২০নং চিত্র—গোখুরা সাপ।

তেমনি সাপের প্রিয় খাদ্য—ব্যাঙ। নেউল মাটিতে গর্ত ক'রে বাস করে। সাপ নেউলের খাদ্য। নেউল মানুষের উপকার করে। অনেক মারাত্মক বিষধর সাপ নেউল মেরে ফেলে। শেয়াল মাটির মধ্যে বড় বড় গর্ত ক'রে বাস করে। এরা রাতে শিকারে বের হয়। গৃহস্থের হাঁস-মুরগি রাতে চুরি ক'রে এরা খায়। স্থলের প্রাণীদের মধ্যে গোরু, ভেড়া, মোষ, ছাগল, ঘোড়া—এরা মানুষের চারপাশে থাকে। এরা নানা ভাবে মানুষের উপকার করে। বাঘ, চিতা, হায়না বনে-জঙ্গলে বাস করে এবং এরা সুযোগ পেলেই মানুষ খায়। হরিণ, সম্বর—এরা বনে-জঙ্গলে বাস করলেও, মানুষ শিকার ক'রে এদের খায়। বানর স্থলের প্রাণী। গাছে-গাছে বাস করে। তরি-তরকারি ও ফল এদের খাদ্য। মানুষের খাবার খেয়ে নেয়, তাই বানর আমাদের অপকারই করে। শুয়োরকে মানুষ

গৃহপালিত প্রাণী হিসেবে পোষে। এদের মাংস ও চর্বি মানুষের উপকারী খাদ্য। কুকুর খুবই প্রভুভক্ত প্রাণী। গৃহস্থের বাড়ি এরা রাতে পাহারা দেয়। অনেকে তাই বিদেশী, দামী কুকুর পোষে। বিড়াল প্রত্যক্ষভাবে



২১নং চিত্র—এরা প্রত্যেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণী ও মানুষের চিরসাথী।

মানুষের কোন উপকার করে না, পরোক্ষভাবে ইঁদুর মেরে মানুষের উপকার করে। খেচর প্রাণীদের মধ্যে পাখি ও পতঙ্গই প্রধান। চড়ুই, টিয়া, শালিক প্রভৃতি পাখি যেমন একদিকে গাছের কীটপতঙ্গ খায়, তেমনি তরি-তরকারি ও ফল নষ্ট ক'রে দেয়। কাক গৃহস্থের বাড়ির নোংরা ও আবর্জনা খেয়ে মানুষের উপকার করে। মুরগি খেচর প্রাণী হলেও, মানুষের পোষা পাখি। ফলে, মুরগি গৃহপালিত হওয়ায় আর উড়তে পারে না। মুরগি মানুষের উপকারী খাদ্য। মুরগির চাষ মানুষকে অর্থ ও খাদ্য দেয়। প্রজাপতি, মৌমাছি, ফড়িং—এরা ফুলের পরাগ-সংযোগ ঘটায়। তার ফলে—ফুল, ফল ও বীজের সৃষ্টি হয়। মানুষ উদ্ভিদের

উপর নির্ভরশীল। তাই প্রজাপতি, মৌমাছি ও ফড়িং আমাদের পরম বন্ধু। মৌমাছির মধু ও মোম মানুষ ব্যবহার করে। শকুন মরা ও পচা প্রাণী খেয়ে মানুষের উপকার করে। চিল ও বাজপাখি মানুষের কোন উপকারে আসে না, বরং পাখিদের ডিম খেয়ে ফেলে। বাদুড় স্তন্যপায়ী হলেও, খেচর। গাছের ফল খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। মশা ও মাছি মানুষের পরম শত্রু। নানারকমের রোগের জীবাণু এরা বহন ক'রে মানুষের শরীরে ও খাবারে মিশিয়ে দেয়। নানারকমের কীটপতঙ্গ শস্য নষ্ট ক'রে মানুষের প্রচুর ক্ষতি করে। তাই এই ধরনের কীটপতঙ্গের হাত থেকে শস্য বাঁচাবার জন্যে মানুষ শস্যের উপর জলীয় রাসায়নিক দ্রব্য 'স্প্রে' ক'রে এদের ধ্বংস করে। পায়রা মানুষের শখের পাখি। ইদানীং পায়রার সাহায্যে দূর-দূর জায়গায় খবর পাঠানো হচ্ছে। কাগজে



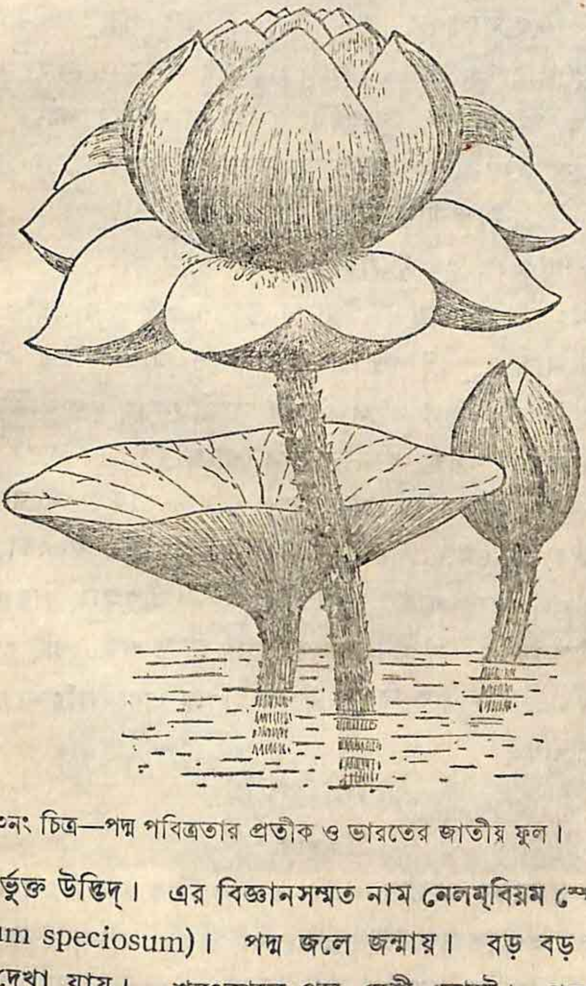
২২নং চিত্র—পায়রার বহিরাকৃতি।

বার্তা লিখে পায়রার পায়ে বেঁধে সেটিকে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে উড়িয়ে দিলে, পায়রা ঠিক জায়গায় সংকেত-বার্তা পৌঁছে দেয়। মুরগির মতো মানুষ পায়রাও খায়। এ-ছাড়া হাঁস, স্নাইপ ও বক মানুষের প্রয়োজনীয় পাখি।

জাতীয় ফুল

পদ্ম

আমাদের দেশে নানারকমের গাছ আছে, তার মধ্যে প্রচুর ভালো, সুগন্ধ ও উজ্জ্বল ফুলের গাছ দেখা যায় ; যেমন—গন্ধরাজ, জুঁই, রজনীগন্ধা, গোলাপ ইত্যাদি। কিন্তু পদ্মফুলের কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। পদ্ম নিম্‌ফীয়াসিঈ (Family : Nymphaeaceae)



২৩নং চিত্র—পদ্ম পবিত্রতার প্রতীক ও ভারতের জাতীয় ফুল।

গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উদ্ভিদ্। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম নেলম্‌বিয়ম স্পেসিওসম (Nelumbium speciosum)। পদ্ম জলে জন্মায়। বড় বড় ঝিলে ও পুকুরে পদ্ম দেখা যায়। শরৎকালে পদ্ম বেশী ফোটে। পদ্মের কাণ্ড

দেখা যায় না। কারণ কাণ্ডটি আদার মতো এবং মাটির ভেতর থাকে। এর গাঁটে গাঁটে লম্বা-বৃন্ত-যুক্ত পাতা ও ফুল বের হয়। পাতা ও ফুল জলের উপর ভাসে। পাতাগুলি খুব বড় ও গোলাকৃতি। ফুল ফোটার আগে গম্বুজের মতো দেখায়। পাপড়ির পর পাপড়ি—একের পর এক এমনভাবে সাজানো থাকে, যাতে ফুল দেখতে গম্বুজের মতো হয়। এতো বড় আকারের ফুল খুব কম দেখা যায়। পদ্ম আমাদের ভারতের দেশীয় ফুল এবং এই ফুলের উল্লেখ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থেও পাওয়া যায়। ফুলের রঙ সাধারণতঃ গোলাপী বা সাদা হয়। লাল পদ্ম ও নীল পদ্মের উল্লেখ অনেকে ক'রে থাকেন। লাল পদ্ম সব জায়গায় দেখা যায় না। নীল পদ্মও খুব কম লোক দেখেছেন। শোনা যায়, হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ের মাঝে জলায় নীল পদ্ম দেখা যায়। ফুলের বৃন্তের ভেতরকার তন্তু বা সুতো দিয়ে হিন্দু-মন্দিরে প্রদীপের সলতে তৈরি হয়। পদ্মের মূল বা গাঁট-যুক্ত কাণ্ড, পাতা, ফুলের বৃন্ত এবং বীজ ভারতের নানা অঞ্চলে খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হয়। ঈশ্বরের পূজায় এই ফুল পুরাকাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে, তাই পদ্ম হিন্দুদের কাছে অতি পবিত্র এবং ভারত সরকার একে জাতীয় ফুল ব'লে উল্লেখ করেছেন। পদ্ম-উদ্ভিদের পাতা ও বৃন্তের রস-সেবনে বসন্ত, ঘাম প্রভৃতি রোগে উপকার হয়। বমি বন্ধ করার জন্যে বীজ চূর্ণ ক'রে সেবন করলে বমি-ভাব কমে যায়। পদ্ম-উদ্ভিদের মূলের রস চর্মরোগের ঔষধ। পশ্চিমবাংলায় শরৎকালে ফুলের বাজার পদ্মফুলে ভরে যায়। দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজায় পদ্মফুল একটি অপরিহার্য উপকরণ। শ্রীশ্রীনারায়ণের চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভা পায়। তাই পদ্ম হিন্দুদের এত প্রিয় এবং পবিত্রতার প্রতীক হিসাবে পরিগণিত।

জাতীয় পাখি

ময়ূর

ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি এবং কার্তিক ঠাকুরের বাহন। বহু পৌরাণিক কাহিনীতে ময়ূরের উল্লেখ দেখা যায়। জীবন-বিজ্ঞানীরা এই পাখিকে মুরগি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ময়ূরের বিজ্ঞানসম্মত নাম হ'ল



কার্তিক ঠাকুরের বাহন ময়ূর
ভারতের জাতীয় পক্ষী

পাভো ক্রিস্‌টাটাস (Pavo cristatus)। এর দেহ বেশ বড়। লেজ বাদ দিলে, দেহটি প্রায় বড় বাজপাখির মতো। পুরুষ-ময়ূরের লেজ প্রায় তিন থেকে চার ফুট লম্বা হয়। ময়ূরের আদি-নিবাস ভারতবর্ষে ও সিংহলে। হিমালয় পর্বতমালার পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতেও ময়ূরের দেখা মেলে।

সাধারণতঃ জলার ধারে বনে-জঙ্গলে ময়ূর বাস-করা পছন্দ করে। এরা ছোট ছোট দলে ঘুরে বেড়ায়। একটি পুরুষ-ময়ূরের সঙ্গে চার-পাঁচটি স্ত্রী-ময়ূর একটি দলের সূচনা করে। স্ত্রী-ময়ূর দেখতে ভালো হয় না এবং তাদের লেজের পালকও পুরুষ-ময়ূরের মতো লম্বা ও বিচিত্র রঙের হয় না। পুরুষ-ময়ূর দেখতে সুন্দর, এবং একটি শুভ পাখি হিসেবে গণ্য করা হয়। ময়ূরের মাথাটি ছোট এবং সুন্দর গঠন। চোখ তুটি খুব উজ্জ্বল। ঠোঁটটি লম্বা এবং মুরগির মতো একটু বাঁকানো। গলা লম্বা এবং গাঢ় নীল। মাথায় ঝুঁটি ও ঝুঁটিতে পাঁচটি পালক পর-পর সাজানো থাকে। প্রতিটি পালকের মাথায় গোলাকৃতি চাঁদ আঁকা থাকে। দেহের পালকও দেখতে সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর দেখতে লেজের বড় বড় পালকগুলি। লম্বা পালকগুলির মাথায় চাঁদের মতো রঙিন চিহ্ন থাকে। এগুলিকে 'ময়ূরের চোখ' বলে। দেহের ও লেজের রঙ খুব সুন্দর এবং রোদে এর রঙ বদলায়।

ময়ূর চট্‌ ক'রে উড়তে পারে না। কিন্তু বেশ শব্দ ক'রে একবার উড়তে পারলে এরা ভালো ওড়ে এবং অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারে। দিনের বেলায় এরা মাটিতে ঘুরে বেড়ায় ও রাতে গাছের ডালে ব'সে থাকে। এদের চোখ খুব জোরালো এবং কানও খুব সজাগ। স্বভাবে ময়ূর খুব ভীরু। সামান্য শব্দে এরা ভয় পেয়ে যায় ও নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। [২৪নং রঙিন চিত্র দেখ।]

পুরুষ-ময়ূর যখন লেজ (পেখম) তুলে নাচে, সে দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। গোল পাখার মতো লেজের পালকগুলি সাজিয়ে সামনে-পেছনে দোলায় এবং সেই তালে পা তুলে-তুলে নাচে। সাধারণতঃ বৃষ্টি আসার আগে বা কালো মেঘ দেখলে এরা নাচতে থাকে। স্ত্রী-ময়ূর দেখতে আকারে ছোট ও পেখম থাকে না এবং নাচেও না।

ময়ূর সব জিনিসই খায়। ধান, গম ও ছোলা—এদের প্রিয় খাদ্য। এ-ছাড়া নানা উদ্ভিদের বীজ এরা মাটি থেকে তুলে খায়। ময়ূর পতঙ্গ, কীট, ছোট টিকটিকি, কেঁচো, এমনকি সাপের ডিম ও বাচ্চা সাপও খেয়ে ফেলে। শুকনো কাঠি ও পাতা দিয়ে এরা গাছের মোটা ডালে বাসা তৈরি করে এবং স্ত্রী-ময়ূর তিনটি থেকে পাঁচটি পর্যন্ত ডিম পাড়ে। আটাশ দিনের মাথায় ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়।

মুরগির মতো ময়ূরও গৃহপালিত পাখি। এরা ভালো পোষ মানে। গৃহস্থের উঠোনে ও বাগানে নির্ভয়ে এরা ঘুরে বেড়ায়। এদের স্বর খুব তীক্ষ্ণ ও কর্কশ, রূপের ঠিক বিপরীত। হিন্দু-গৃহস্থেরা ময়ূরকে পবিত্র পাখি ব'লে মনে করে। অনেকের বাড়িতে শুভ প্রাণী হিসেবে ময়ূর থাকে। আগ্রায় তাজমহলের চারপাশের বাগানে অসংখ্য ময়ূরকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

জাতীয় পশু

বাঘ

বাঘ পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়। স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্গত কার্‌নিভোরা (Carnivora) গোত্রের প্রাণী। এর বিজ্ঞানসম্মত নাম প্যান্‌থেরা টাইগ্রিস (Panthera tigris)। সিংহের মতোই এরা শক্তিশালী এবং আকারে প্রায় সিংহের মতো। এরা শিকার ক'রে জীবনযাপন করে। বাঘের মাথা সিংহের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং কেশর নেই। এদের নাকের গর্ত প্রায় কপালে উঠে গিয়েছে। সুন্দরবনের বাঘ লম্বায় সবচেয়ে বড় হয়। নাক থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত এগারো ফুট অবধি বাঘ দেখা গেছে। স্ত্রী-বাঘ সাধারণতঃ পুরুষ-বাঘের চেয়ে লম্বায় ছোট হয়। এশিয়ায় প্রধানতঃ বাঘের বাস। সাইবেরিয়া, উত্তর চীন, জাভা, সুমাত্রা, বালি ও মালয় প্রভৃতি দেশগুলিতেও এদের দেখা যায়। ভারতবর্ষে প্রধানতঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বাঘ প্রচুর। এরা নরখাদক হওয়ায় প্রতিবছর বহু লোক এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়।



২৫নং চিত্র—'এক যে ছিল বাঘ, তার গায়ে ডোরা-ডোরা দাগ'—
পশ্চিমবঙ্গের বাঘ ভারতের জাতীয় পশু।

সিংহের মতো এরা দেখতে এক রঙের নয়, কিংবা সিংহের মতো এদের মাথায়, ঘাড়ে ও গলায় চুলের কেশরও থাকে না। বাঘের গায়ের রঙ অতি সুন্দর এবং লোম-সমেত চামড়া মসৃণ। এদের মাথার রঙ হালকা হলুদ এবং চোখের উপর গোল সাদা দাগ থাকে। এদের, বিশেষতঃ পুরুষ-বাঘের গাল ও গোঁফের জায়গা থেকে লম্বা লম্বা চুল বের হয়। একেই কথায় বলে 'বাঘের গোঁফ'। বাঘের দেহের উপরকার রঙ হালকা হলুদ এবং দেহের দু'পাশে কালো ডোরা-কাটা দাগ দেখা যায়। সিংহের লেজের মতো বাঘের লেজের শেষে লোমগুচ্ছ থাকে না। লেজের রঙ হালকা হলুদ এবং মাঝে মাঝে কালো বেষ্টনী দেখা যায়। বিভিন্ন পরিবেশে বাঘের রঙ বদলায়। বাংলার বাঘ দেখতে সবচেয়ে সুন্দর। বাঘের পেটের দিক, পায়ের পেছন ও গালের রঙ প্রায় সাদা।

বাঘ প্রধানতঃ গভীর বাঁশ-বনে, ঘাসশূন্য বড় জঙ্গলে ও লোকালয়ের বাইরে জলাশয়ের কাছাকাছি ঝোপ-ঝাড়ে বাস করে। শুক্‌নো স্থান এরা মোটেই পছন্দ করে না। এরা দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে এবং রাতে প্রাণী-শিকারে বের হয়। জলা-জঙ্গলভূমি এদের খুব প্রিয়। সাধারণতঃ হরিণ, ছাগল, গোরু, ময়ূর, শুয়োর, মোষ প্রভৃতি বাঘের প্রিয় খাদ্য। বাঘ মানুষ খেতে ভালবাসে। গোরু, ছাগল ও হরিণের মতো তৃণভোজী শ্রেণীর প্রাণীরা যখন জলাশয়ে জল পান করতে আসে, তখন ঝোপের লুকোনো জায়গা থেকে লাফ দিয়ে বাঘ তাদের হঠাৎ আক্রমণ করে। শিকার মেরে ফেলে এরা তখনই তা খায় না। মুখে ধ'রে টানতে টানতে নিজের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে খায়। খাবার সে একদিনে শেষ করে না। চার-পাঁচ দিন ধ'রে রেখে খায়। সাধারণতঃ পুরুষ-বাঘই 'মানুষ-খেকো বাঘ' নামে পরিচিত। মানুষকে অতর্কিতে আক্রমণ ক'রে তাকে পিঠে ফেলে বহুদূর পর্যন্ত নিয়ে যায়। দেখা গেছে যে, পুরুষ-বাঘ বেশী বয়সে কেবল মানুষ শিকার ক'রে খায়। তখন তাদের দাঁতের জোর থাকে না ও পায়ের পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্যান্য দৌড়-প্রাণীদের সঙ্গে দৌড়ে শিকার করতে পারে না। তখন এই ধরনের বাঘ লোকালয়ের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায় এবং ঝোপ-ঝাড়ে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ পেলে মানুষ ধ'রে নিয়ে

যায়। একবার মানুষ ধ'রে খেতে পারলে, বাঘ 'মানুষ-খেকো' হয়ে যায় এবং মানুষ ধ'রে খাওয়াই তার নেশায় পরিণত হয়। গ্রামের ধারে এরা গৃহপালিত গোরু, ছাগল, এমনকি হাঁস-মুরগিও ধ'রে খায়।

স্ত্রী-বাঘ দুই বছর অন্তর দুটি থেকে ছ'টি পর্যন্ত বাচ্চা একসঙ্গে প্রসব করে। মায়ের কাছে বাচ্চারা প্রায় দুই বছর বয়স পর্যন্ত থাকে। এই সময়ে মা বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং শিকার ধ'রে এনে তাদের খাওয়ায়। এমনও দেখা গেছে যে, বাঘ তার বাচ্চাদের দূরে রেখে, শিকার কি ক'রে ধরতে হয় তা শেখায়। দুই বছর বয়স পূর্ণ হবার পর বাঘ বড় হয়ে স্বাধীনভাবে একা-একা ঘুরে বেড়ায়। শিকারীরা বলেন, বাঘ পুরোনো ভাঙা-বাড়ি বা মন্দিরের ধারে-কাছে থাকতে ভালবাসে। এরা দরকার হলে গাছেও কিছুটা উঠতে পারে। বাঘ শান্ত জলে ও নদীতে ভালো সাঁতার কাটতে পারে। জীব-বিজ্ঞানীরা বাঘ ও সিংহের সহবাসে (পুরুষ-সিংহ ও স্ত্রী-বাঘ) নতুন জীব লাইগার সৃষ্টি করেছেন। আবার পুরুষ-বাঘের সঙ্গে স্ত্রী-সিংহের সহবাসে যে জীবের সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে টাইগন।

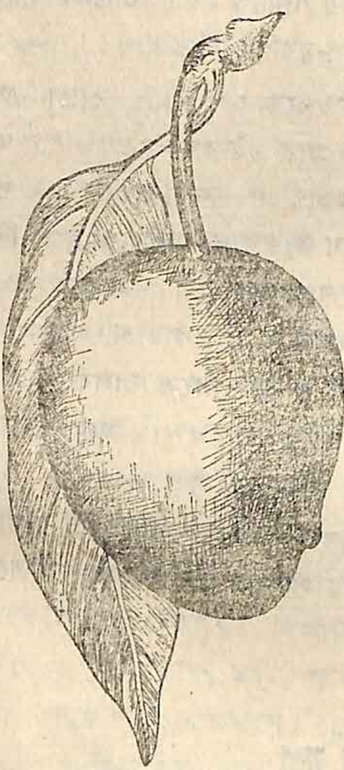
জাতীয় ফল

আম

আম মূলতঃ ভারতের গাছ এবং ভারতেই আম বেশী জন্মায়। দোআঁশ মাটিতে আমের ভালো চাষ হয়। কন্যাকুমারিকা থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই আমের চাষ হয়। তার মধ্যে উত্তর ভারতে ও পশ্চিমবঙ্গে গাঙ্গেয় পলিমাটির অঞ্চলেই সর্বোৎকৃষ্ট আম জন্মায়। আম সারা বছরের ফল। পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে বড় বড় আম-বাগান আছে। এক-একটি বাগানে এক হাজার থেকে তিন হাজার পর্যন্ত গাছ থাকে। পলাশীর এই রকমের একটি আম-বাগানের কাছে যুদ্ধ হয়েছিল সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের।

আমগাছের কাণ্ড মসৃণ হয় না। গাছের ছাল কোন জায়গায়

উঁচু, আবার কোন জায়গায় নিচু হয়। বড় লাল-পিঁপড়া আমগাছের কাণ্ডে নিরাপদে বাস করে। এরা আমগাছের পাতা, কাণ্ড ও শাখার রস খেয়ে জীবন কাটিয়ে দেয়। কাণ্ডের এ-ধরনের পিঁপড়ার কামড় খুব যন্ত্রণাদায়ক। তাই কোন তৃণভোজী প্রাণী এই পিঁপড়ার কামড়ের ভয়ে গাছের পাতা খেতে পারে না। বছর বছর আমগাছের গোড়ায় পুকুরের পাঁক দেওয়া হয়। এতে আমের ফলন ভালো হয়। মাঘ মাসে (ইংরেজী মার্চ মাসে) আমের মুকুল বের হয়। এই সময়ে আম-চাষীরা কীটনাশক ওষুধ জলে গুলে আমের মুকুলের ওপর 'স্প্রে' ক'রে দেয়। এতে পোকা নষ্ট হয়ে যায়, আর মুকুল সতেজ থাকে। মাঘ মাসের শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজার সময়ে আমের মুকুল উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



২৬নং চিত্র—আম কেবল ছোটদের প্রিয় ফল নয়, বয়স্করাও আমের সমান ভক্ত।

বৈশাখ মাস থেকে আম পাকতে শুরু করে। ঋতুর প্রথমদিকে পেয়ারাফুলি, সোরি, তারপর গোলাপখাস আম বাজারে পাওয়া যায়। মাঝামাঝি সময়ে পাকে প্রায় একই-জাতীয় হিমসাগর, গোপালভোগ, ক্ষীরসাপাতি ও বোম্বাই। ল্যাংড়া ও ফজলি শেষের দিকে বাজারে আসে। অনেকের মতে ল্যাংড়া সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। তার মধ্যে বেনারসের ল্যাংড়া গন্ধে ও স্বাদে সবচেয়ে ভালো। পশ্চিমবঙ্গে মুরশিদাবাদ ও মালদহে ফজলি আমের চাষ হয়। ফজলি মালদহের অর্থকরী ফসল। এটি আকারে খুব

বড় হয়। চুটোর ওজন প্রায় এক কিলোগ্রামের কাছাকাছি। উত্তরপ্রদেশের দশেরী, বোম্বাইয়ের আলফান্সো এবং দক্ষিণ ভারতের বাঙ্গানপল্লের বা বেগুনফুলি আম পশ্চিমবঙ্গের বাজারে আসে। প্রকৃতপক্ষে সারা ভারতের আমের বড় গ্রাহক পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীরা।

আম যখন কাঁচা থাকে তখন আমরা আমের টক (অম্বল) রান্না করি। কাঁচা আম কেটে টুকরো টুকরো ক'রে 'আমসি' তৈরি ক'রে রাখি। আম আর সর্ষে-বাটা দিয়ে আমরা 'আম-কাসুন্দি' তৈরি ক'রে রাখি। এ-ছাড়াও মিষ্টি আমের আচার, টক আমের আচার ও আম-তেল বাড়িতে মা-বোনেরা আমের সময় তৈরি ক'রে রাখেন। পাকা আমের রস থেকে আমসত্ত্ব তৈরি হয়। এখন অনেকে আমসত্ত্ব-তৈরি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে কাজে লাগাচ্ছে। সেইজন্যই আমরা বারোমাসই বাজারে আমসত্ত্ব পাই। দুধের সঙ্গে পাকা আমের মিষ্টি রস মিশিয়ে খাওয়া আগেকার দিনের বাঙালীদের প্রিয় খাদ্য ছিল।

পাকা আমে 0·6% প্রোটিন, 11·8% কার্বোহাইড্রেট ও 0·1% ফ্যাট আছে। পাকা আমের প্রতি 100 গ্রামে ক্যালরির পরিমাণ 50 ও ভিটামিনের পরিমাণ 4,800 মিলিগ্রাম। প্রতি 100 গ্রাম পাকা আমের রসে ভিটামিন সি-এর পরিমাণ 13 গ্রাম।

আমের সমাদর পৃথিবীর সর্বত্র। তাই ভারত সরকার আম ও আমের রস বিদেশে রপ্তানি করছেন প্রচুর পরিমাণে। আম-জাত অন্যান্য জিনিসও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। এর ফলে কয়েক কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রা প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ অর্জন করছে এবং আমের চাহিদাও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। ফলের মধ্যে আম সস্তা, সহজলভ্য ও এতে প্রচুর প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু থাকায় আমকে 'ফলের রাজা' বলা হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বোধেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সজীবের পরিচয়

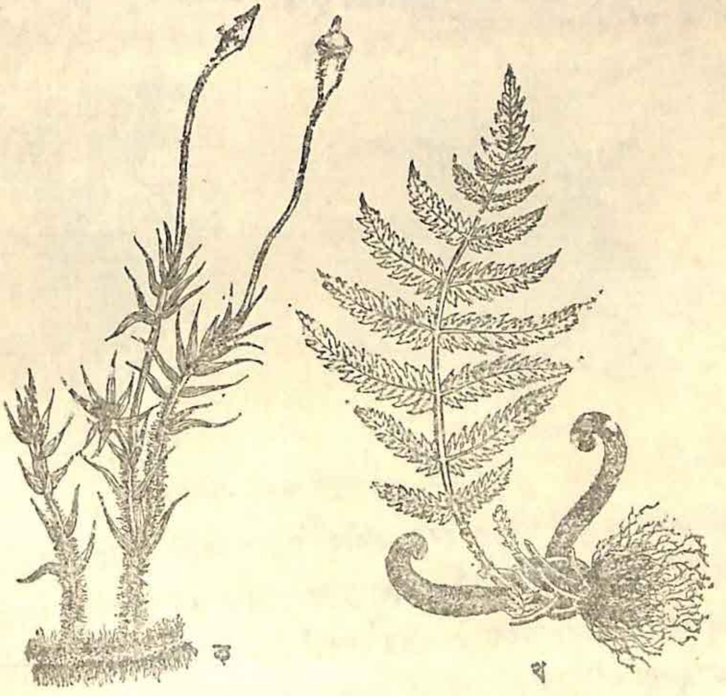
আমাদের চারপাশে প্রচুর সজীবের সমাবেশ। নানাপ্রকারের উদ্ভিদ্ ও নানারকমের জীবজন্তু আমরা দেখতে পাই। প্রাচীনকালে কবিরাজী শাস্ত্রে অনেক বই ছিল, যাতে উদ্ভিদ্-চেনার পদ্ধতির নানারকমের বর্ণনা আছে। প্রাণীদের মধ্যে মানুষ প্রধান ও শ্রেষ্ঠ জীব। বোধেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মানুষ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনের নানাদিকের পরিচয় পায়। চোখ, নাক, কান ও জিভ—এইগুলি মানুষের বোধেন্দ্রিয়। এমন কি গায়ের চামড়াও সময় সময় সজীবের পরিচয়ের কাজে লাগে। কিন্তু এসবের আগে প্রকৃতিকে জানবার আগ্রহ থাকা চাই। একটি উদ্ভিদ্‌কে সাধারণ মানুষ যেভাবে দেখে, একজন জীবন-বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে ঠিক সেভাবে না দেখে একটা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখা উচিত। জানবার একান্ত আগ্রহ ও বিজ্ঞানী-সুলভ দৃষ্টির ফলেই নানারকমের সজীবের জীবনধারার রহস্য আজ আমরা জানতে পেরেছি। ছাত্রদের এর জন্যে একটি হ্যাণ্ড-লেন্স, একটি ছুরি ও একটি ছুঁচ সবসময় কাছে রাখা দরকার। এগুলি সজীবের পরিচয় জানবার সময় দরকার হয়। সজীবের পরিচয়ের ধারা একটা নোটখাতায় নিয়ম ক'রে লিখে রাখলে নতুন তত্ত্ব পরে কতটা জানা গেল, সেটা বোঝা যায়। বিভিন্ন বোধেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সজীবের পরিচয় কি-ভাবে জানা যায় তার বিবরণ দেওয়া হ'ল :

চোখ দিয়ে দেখে সজীবের পরিচয়

দেওয়ালে ভেলভেটের মতো সবুজ চাদর থেকে খানিকটা তুলে হাতের উপর রেখে লেন্স দিয়ে দেখলে সবুজ সজীব বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। একটি ছোট উদ্ভিদ্। তার মাথার উপর টুপির মতো বস্তু দেখা যায়। বস্তুর তলায় ঘোরানো ঘোরানো অনেক সবুজ পাতা। আবার কাণ্ডের শেষ অঞ্চল থেকে সুতার মতো অনেক শুঁয়া বা মূল দেখা যায়। এটি মস্ উদ্ভিদের পরিচয়। মস্ অপুষ্পক উদ্ভিদ্।

ফার্ন বা ঘেঁটুশাক গ্রামে-গঞ্জে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় প্রচুর জন্মায়। মসের যেমন একটা আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আছে তেমনি ফার্নেও আছে। এটি মসের তুলনায় আকারে অনেক বড়। এক-একটি পাতা বেশ বড় এবং বোটার দু'ধারে থাকে অনেক খাঁজ-কাটা অনুপত্র। ফার্নও অপুষ্পক উদ্ভিদ্। অনুপত্রগুলিকে তুলে তার পেছন দিকে দৃষ্টি দিলে সারি সারি কালো বস্তু দেখা যায়। এদেরকে ফার্নের সোরাস বা বংশ-বিস্তারের অঙ্গ বলা হয়। কাণ্ডের শেষ থেকে সরু সরু মূল বের হতে দেখা যায়। যৌগিক খাঁজ-কাটা অনুফলক-বিশিষ্ট পাতা, কালো সোরাস ও কাণ্ড থেকে মূলের বিস্তার ফার্নের পরিচয়। শুধু চোখে দেখেও এই দুটি উদ্ভিদ্কে সহজেই চেনা যায়।

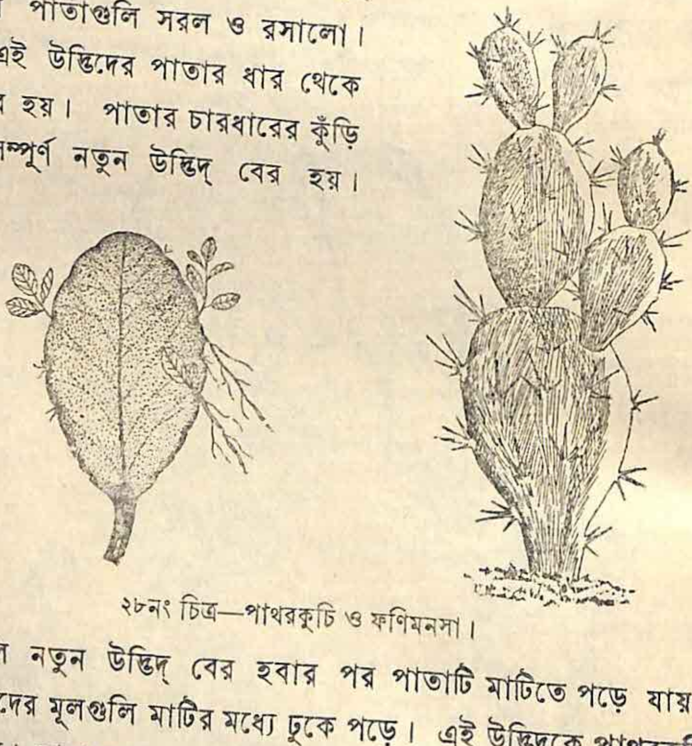
তোমরা ঝোপে-জঙ্গলে বা বাগানের বেড়ার ধারে একধরনের উদ্ভিদ্ দেখে থাকবে। উদ্ভিদ্টির গোলাকার কাণ্ড ব'লে কিছু দেখা



২৭নং চিত্র—দেওয়ালের সবুজ মস্ (ক) ও বাহারে ফার্ন বা ঘেঁটুশাক (খ) উদ্ভিদ্।

যায় না, বরং স্থূল পাতা একটির উপর একটি সাজানো অবস্থায় দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে কাণ্ডটাই চ্যাপটা হয়ে গিয়ে পাতার আকার নেয়। পাতার এক-এক জায়গা থেকে গুচ্ছ-গুচ্ছ কাঁটা বের হতে দেখা যায়। এই ধরনের উদ্ভিদ্ অনেক সময় গৃহস্থের বাড়ির ছাদে, টবে পোঁতা অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণতঃ উঁই ঢিপির পাশেই এদের বেশি দেখা যায়। উদ্ভিদ্‌টির এই বৈশিষ্ট্য সকলকে আকৃষ্ট করে। এটি ফণিমনসা উদ্ভিদ্। চ্যাপটা, ঘন-সবুজ রসালো কাণ্ড ও তার উপর গুচ্ছ-গুচ্ছ কাঁটা—ফণিমনসার পরিচয়।

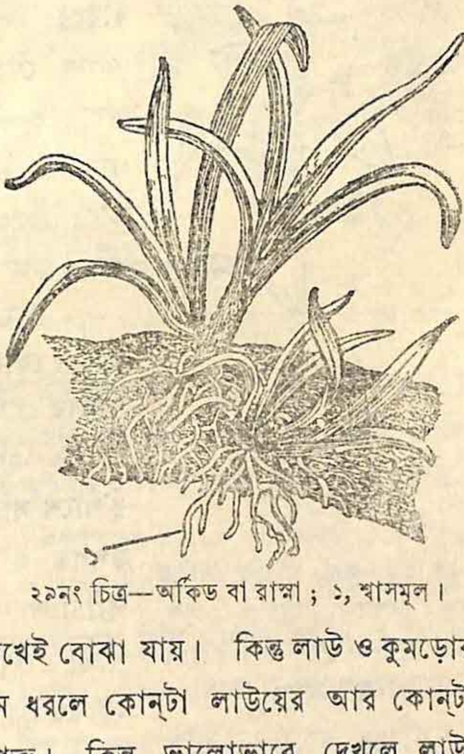
স্থূল পাতা-বিশিষ্ট আর একরকমের উদ্ভিদ্‌ও দেখা যায়, ঝোপে-জঙ্গলে বা বাগানের বেড়ার ধারে। এই উদ্ভিদের পাতাগুলি সরল ও রসালো। অদ্ভুত এই উদ্ভিদের পাতার ধার থেকে কুঁড়ি বের হয়। পাতার চারধারের কুঁড়ি থেকে সম্পূর্ণ নতুন উদ্ভিদ্ বের হয়।



২৮নং চিত্র—পাথরকুচি ও ফণিমনসা।

অনেকগুলি নতুন উদ্ভিদ্ বের হবার পর পাতাটি মাটিতে পড়ে যায়। তখন উদ্ভিদের মূলগুলি মাটির মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই উদ্ভিদ্‌কে পাথরকুচি উদ্ভিদ্ বলে। নানা অবস্থায় এদের দেখা যায়। ফণিমনসা ও পাথরকুচি গ্রামে খুবই পরিচিত। এই দুটি উদ্ভিদ্ ওষুধরূপে নানারোগে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।

আমগাছ সকলেই দেখে থাকবে। বিরাট বড় গাছ, অনেক শাখা-প্রশাখা নিয়ে মাটি অাঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এর পাতা ঘন সবুজ, লম্বা, সরল। এক-একটি পর্বে পাঁচ থেকে সাতটি পাতা বের হতে দেখা যাচ্ছে ব'লে মনে হয়। কিন্তু ভালো ক'রে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রতি পর্ব থেকে একটি পাতাই বেরিয়ে আসে। আমের মুকুলের বিন্যাস ও আম—এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য। আমের পাতার আকার আমগাছকে চিনিয়ে দেয়। আমগাছের কোটরে নানা পাখি তাদের বাসা বাঁধে। আবার আমগাছের দুই ডালের সংযোগে একরকমের উদ্ভিদ্ দেখা যায়। এই উদ্ভিদের পাতা গাঢ় সবুজ ও বেশ লম্বা, মোটা ফিতার মতো। উদ্ভিদের গুড়ি থেকে অনেকগুলি সাদা লম্বা মূল বাতাসে ঝুলতে দেখা যায়। এই উদ্ভিদে বেগুনি রঙের ফুলও দেখা যায়। মাটিকে বাদ দিয়ে গাছের উপরে থাকা এই উদ্ভিদ্‌টিকে অর্কিড বা রাস্না বলা হয়। রাস্নার বৈশিষ্ট্য তার গাছের উপর জীবনযাপন, তার পাতা ও বাতাসে ঝুলন্ত মূল। ভালো ক'রে দেখলেই রাস্নার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে ধরা পড়ে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায়।



২৯নং চিত্র—অর্কিড বা রাস্না ; ১, শ্বাসমূল।

কুমড়ো ও লাউ উদ্ভিদের ফলের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য। কোন্‌টা লাউ আর কোন্‌টা কুমড়ো চোখে দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু লাউ ও কুমড়োর পাতা-সমেত দুটি ডাল সামনে ধরলে কোন্‌টা লাউয়ের আর কোন্‌টা কুমড়োর ডাল তা বোঝা শক্ত। কিন্তু ভালোভাবে দেখলে লাউ-কুমড়োর গাছের পার্থক্য সহজে বোঝা যায়। কুমড়োর করতলাকার

পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় এবং এর ডালে ও পাতায় শুঁয়া প্রচুর ও ঘন-সন্নিবিষ্ট। অপরপক্ষে লাউ-ডাঁটার ও পাতার রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা সবুজ এবং এতে শুঁয়ার প্রাচুর্য কম।

অনেক উদ্ভিদ্ আছে, যাদের কেবল পাতা দেখলেই গাছের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন—চন্দ্রমল্লিকার পাতা, শিয়ালকাঁটার পাতা, থানকুনির পাতা, আমরুল ও শুশনি শাক-এর পাতা। বড় গাছের মধ্যে খেজুর, নারকেল ও তাল গাছের পাতার এমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব পরিচয় আছে, যা চোখে দেখলেই বোঝা যায়।

জবা গাছের ডালের উপর তার পাতার বিন্যাস, পাতার গোড়ায় সরু উপপত্রের উপস্থিতি, ফুলের স্ত্রী-স্তবক ও পুং-স্তবক নলের আকার নিয়ে ফুলের বাইরে বেরিয়ে আসা এবং ফুলের তলায় গোলাকারে পাঁচটি উপবৃতির অবস্থিতি—এসবই জবা গাছের নিজস্ব পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য। এগুলি ভালো ক'রে দেখে নিলে জবা গাছ চিনতে কারও ভুল হবে না।



৩০নং চিত্র—জবা গাছের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে। মূল, কাণ্ড, পাতা ও ফুল—জবা গাছের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

তেমনি মটর গাছের ক্ষেত্রেও। মটরের যৌগিক পাতার আকার বিচিত্র। পাতার গোড়ায় নৌকার মতো ফলাকার উপপত্র এবং যৌগিক পাতার বোঁটার দু'পাশে সারি ক'রে উপপত্র থাকে। শেষ উপপত্র ও তার পিছনের দুটি উপপত্র প্যাঁচালো আকর্ষে পরিণত। এ-ধরনের পাতা শুধু মটর পাতারই বৈশিষ্ট্য। মটরের ফুল অতসী, বক ও অপরাজিতা ফুলের মতো। ফুলের প্রথম স্তবকের ভেতরে থাকে দ্বিতীয় স্তবক। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পাপড়ির ভেতরে থাকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়

পাপড়ি। আবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাপড়ির মধ্যে থাকে চতুর্থ ও পঞ্চম পাপড়ি। ফুলের আকার, বৈশিষ্ট্য ও ফুলের বিভিন্ন স্তবক ভালোভাবে দেখে কোন্‌টি কোন্ গাছের ফুল তা বোঝা যায়। সপুষ্পক উদ্ভিদের নানা পরিচয়ের মধ্যে ফুল একটি প্রধান পরিচয়। চোখে দেখে গাছের



৩১নং চিত্র—মটরের ফলাকার (১) উপপত্র। ৩২নং চিত্র—মটরফুল ও তার বিভিন্ন অংশ।

বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিচয় হলে কোন্‌টা কোন্ গাছ সে-বিষয়ে একটা ধারণা জন্মে। এই ধারণাই গাছগুলিকে চিনিয়ে দেয়। তাই সজীব বস্তু চেনবার ও জানবার সবচেয়ে বড় যন্ত্র হ'ল মানুষের দুটি উজ্জ্বল চোখ।

উদ্ভিদ্‌জগতের মতো প্রাণিজগতের দিকে তাকালে তাদেরও পরিচয় পাওয়া যায়। জীবজগতে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব। তার আকার, গঠন ও দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের বিষয়ে শিক্ষার্থীদের একটা মোটামুটি ধারণা বা পরিচয় আছে। আয়নার সামনে নিজে দাঁড়ালে বা সামনে মানুষ দেখে মানবের আকৃতি সম্বন্ধে পুরোপুরি জ্ঞানলাভ করা যায়। পৃথিবীর যে-কোন জায়গায় মানুষের আকৃতি-বিশিষ্ট জীব দেখলে তারা যে

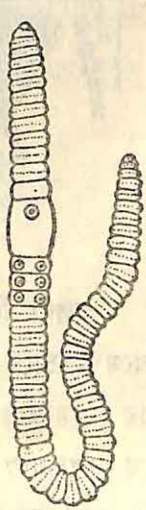
মনুষ্য-জাতি-ভুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সেইরকম মাছের আকৃতির সঙ্গে পরিচয় হলে সেই ধরনের ও আকৃতির জীব দেখলেই তারা যে মাছ তা সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তাই কোন নির্দিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদের সঠিক পরিচয় জানা থাকলে সেটি যে-কোন পরিবেশের মধ্যে থাকলেও তার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যই তাকে চিনিয়ে দেয়। সজীবের বহিরাকৃতি ও আচার-ব্যবহার চোখ দিয়ে নানাভাবে ও নানা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করা যায়, যেমন :

আকারগত পার্থক্য : প্রাণীদের নির্দিষ্ট আকার দেখা যায়। গোরুর একটা নির্দিষ্ট আকার আছে। ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখো গোরুর চারটি পা সমান। পায়ে চেরা খুর, লম্বা গলা ও মাথা, বড় ও লম্বা লেজ, লেজের আগায় চুলের গুচ্ছ ইত্যাদি। সব গোরুর একই রকমের আকৃতি। তাই গোরুর সঙ্গে আকৃতির মিল থাকলে জীবটি যে গোরু তা দেখেই চেনা যায়। তাই আকৃতিগত মিল দেখে এক এক ধরনের জীবকে এক-একটি নাম দেওয়া হয়েছে, যেমন—কুকুর, ভেড়া, ঘোড়া, সাপ, ব্যাঙ, মাছ ইত্যাদি।

রঙের পার্থক্য : জীবের পরিচয়-ব্যাপারে তার রঙের ভূমিকা আছে। পলাশ ও শিমুল ফুলের রঙ উজ্জ্বল লাল, আবার পাঁচ পাপড়ি-বিশিষ্ট জবা ফুলও লাল। তেমনি পুকুরের বড় পানার ফুল দেখতে বেগুনী। বেগুন উদ্ভিদের ফুলও বেগুনী। তাই ফুলের রঙের সাহায্যে সেই উদ্ভিদের পরিচয় কিছুটা জানা যায়। রঙের সাহায্যে পাখি চেনা যায়। এমনকি কোন্ জাতের কোন্ পাখিটা পুরুষ বা কোন্‌টা মেয়ে তাও তাদের রঙের সাহায্যে চেনা যায়। পুরুষ-চড়ুই পাখির চোখের কাছে সাদা দাগ ও গলায় কালো রঙের বেড় থাকে। মেয়ে-চড়ুই পাখির চোখের কাছে সাদা দাগ বা গলায় কালো বেড় নেই। তেমনি রঙ দেখে টিয়া ও চন্দনা চেনা যায়। টিয়ার ঠোঁট টক্‌টকে লাল ও গায়ের রঙ গাঢ় সবুজ। চন্দনার দেহের ও ঠোঁটের রঙও তাই। প্রভেদ শুধু চন্দনার গলায় একটা সরু গোলাপী বেড় আছে, আর আছে দুটো কালো দাগ, যা বেড় থেকে ঠোঁট পর্যন্ত

এগিয়ে গেছে। কুনো-ব্যাঙ ও সোনা-ব্যাঙ—দুটি জীবই ব্যাঙ-জাতীয়। কিন্তু এদের রঙের অনেক পার্থক্য। কুনো-ব্যাঙের রঙ মেটে ও পিঠ কালো-কালো দাগে ভরা। সোনা-ব্যাঙের রঙ হলদে-সবুজ। এদের পিঠে কালো-কালো গুটি নেই (১৭ ও ১৮নং চিত্র দেখ)। গোখুরা বা কেউটে যেমন রঙেরই হোক, এদের ফণার উপর একজোড়া খড়মের দাগ বা গোল চক্রের দাগ দেখা যায়। খড়ম ও চক্র দেখলেই গোখুরা বা কেউটে চেনা যায়। তেমনি যে সাপের রঙ সবুজ-হলদে মেশানো ও গায়ের সর্বাঙ্গে গোল-গোল চাঁদের মতো দাগ, সেটি চন্দ্রবোড়া সাপ ছাড়া অন্য কোন সাপ নয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রঙ দেখেও সজীব বস্তু চিহ্নিত করা যায়।

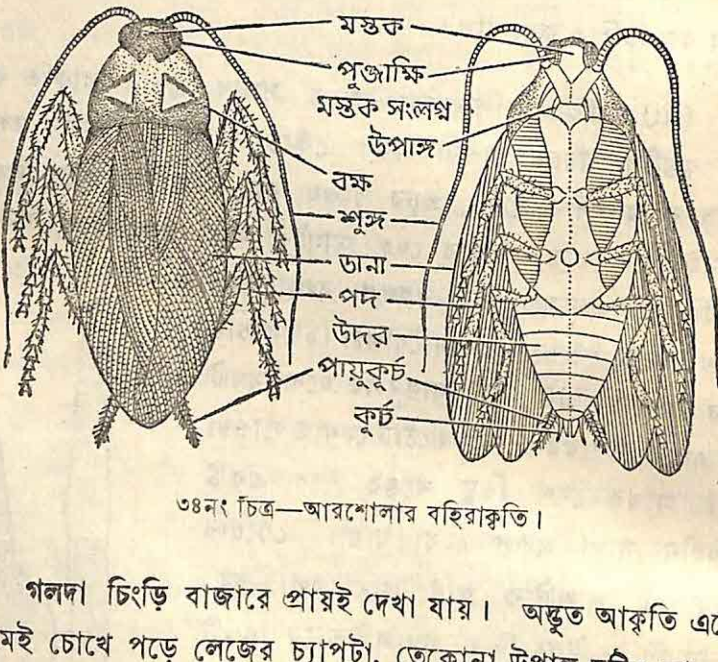
(iii) **বহিরাকৃতির পার্থক্য**ঃ সজীব বস্তুর বহিরাকৃতি লক্ষ্য ক'রে বস্তুটির পরিচয় পাওয়া যায়। কেঁচো স্যাঁতসেঁতে মাটির তলায়, বিশেষ ক'রে বর্ষার সময়ে, প্রচুর পাওয়া যায়। ভালো ক'রে দেখলে, প্রথমেই দেখা যায় কেঁচোর দেহ আংটির মতো খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। খণ্ডগুলিকে 'সেগ্‌মেন্ট' বা দেহখণ্ড বলা হয়। খণ্ডিত দেহই কেঁচোর প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেঁচোর মুখের দিকটা মোটা, দুটি আঙুলের মধ্যে মুখটি টিপে ধরলে, উপরের ও নিচের ঠোঁট দেখতে পাওয়া যায়। মুখের বেশ কিছু খণ্ডের পরে একটি খণ্ডবিহীন সাদা অঞ্চল দেখা যায়। কেঁচোর দেহের এই অংশটিকে ক্লাইটেলাম বলা হয়। কেঁচোর পিঠের উপর দিয়ে লম্বালম্বিভাবে একটি কালো দাগ দেখা যায়। উপরোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখ দিয়ে দেখে চিনে নিতে পারলে, কেঁচো চিনতে আর অসুবিধে হয় না।



৩৩নং চিত্র—কেঁচোর বহিরাকৃতি।

তেমনি আরশোলারও চোখে দেখে চেনার মতো অনেক লক্ষণ আছে। গাঢ় চকোলেট রঙের

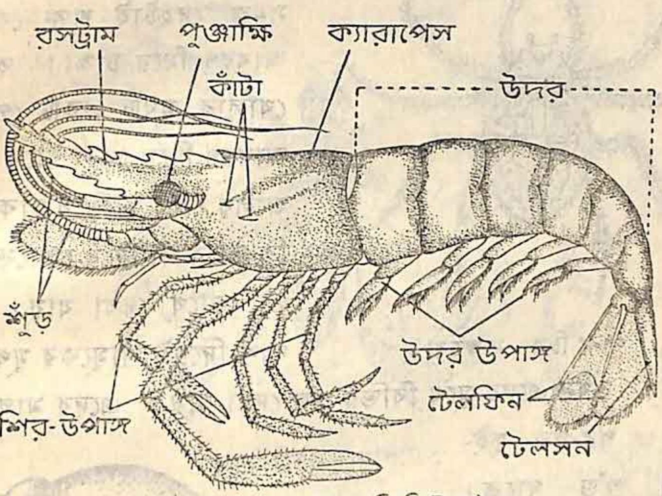
আরশোলার তিন-জোড়া পা খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। মাথায় বড় ছুটি যৌগিক চোখ থাকে। আরশোলা মাথাটি এদিক-সেদিক ঘোরাতে পারে। ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলে দেখা যায় যে, আরশোলার তিন-জোড়া পা বক্ষ-অংশ থেকেই বেরিয়েছে। এর উপর একটা লম্বা আবরণও দেখা যায়। মাথার উপর থেকে এক-জোড়া লম্বা, বহু খণ্ডে বিভক্ত শুঁড় দেখতে পাওয়া যায়। আরশোলার উদর অঞ্চলকে পিঠের দিক থেকে ঢেকে রাখে ছুটি পাখা। প্রথম পাখা শক্ত ও ভঙ্গুর। এর তলায় উড়বার জন্যে পাতলা পাখা দেখা যায়।



৩৪নং চিত্র—আরশোলার বহিরাকৃতি।

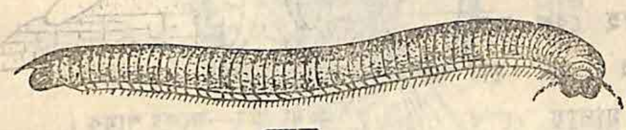
গলদা চিংড়ি বাজারে প্রায়ই দেখা যায়। অদ্ভুত আকৃতি এদের। প্রথমেই চোখে পড়ে লেজের চ্যাপটা, তেকোনা উপাঙ্গ-ছুটির আকারের উপর। মাথার ছ'পাশ থেকে একটি ক'রে মোট ছুটি বেশ বড় যৌগিক চোখ দেখা যায়। ছুই খণ্ডে তৈরী বৃন্তের উপর চোখটি বসানো থাকে। এরা তাই চোখ ঘোরাতে পারে। এদের বুকের আবরণ থেকে মাথার দিকে খাঁজ-কাটা একটা লম্বা অংশ দেখা যায়। এদের পাঁচ-জোড়া পায়ের মধ্যে প্রথম ছ'-জোড়া পা দিয়েই এরা মাটিতে চলাফেরা করে।

আবার পেটের পাঁচ খণ্ড থেকে বের-হওয়া পাঁচ-জোড়া উপাঙ্গ দিয়ে এরা জলে সাঁতার কাটে। চিংড়ির শুঁড় বেশ লম্বা হয়।



৩৫নং চিত্র—গলদা চিংড়ির বহিরাকৃতি।

হাত দিলেই পয়সার মতো গোল হয়ে গুটিয়ে যায় যে প্রাণী, তাদের আমরা বলি কেন্নো। সুতরাং স্পর্শেই কেন্নর পরিচয় পাওয়া যায়।

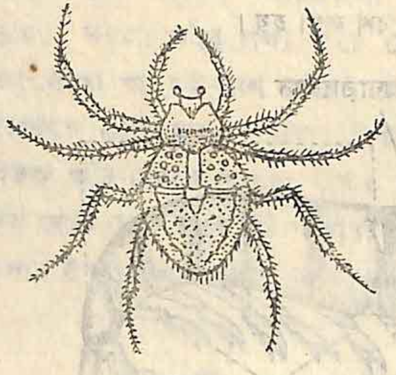


৩৬নং চিত্র—কেন্ন।

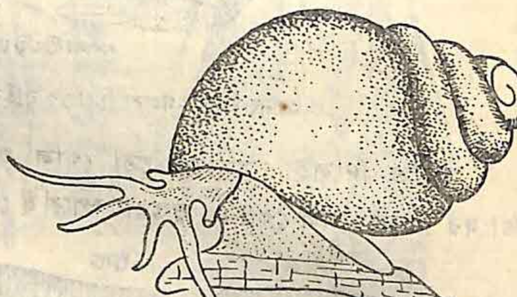
কেন্নর দেহ সরু ও লম্বা এবং খণ্ডিত। এর পায়ের সংখ্যা অনেক ব'লে এদের সহস্রপদী বলা হয়। এদেরও চোখ যৌগিক। মাথার দুটি শুঁড় ছোট হলেও, পরিষ্কার দেখা যায়।

মাকড়সার দেহ ছোট এবং মাথা, বুক ও পেট—তিন ভাগে ভাগ করা যায়। চোখে পড়ার মতো এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল চার-জোড়া গাঁট-যুক্ত লম্বা-লম্বা পা। এদের দেহ শুঁয়ায় ভরা।

গ্রামে-গঞ্জে, পুকুরে প্রচুর শামুক দেখা যায়। শামুক খাদ্য-হিসাবে মানুষ ব্যবহার করে। এদের সমস্ত দেহটাই শক্ত খোলা বা আবরণ দিয়ে ঢাকা। আবরণের খোলার মুখটি একটি গোলাকার আবরণ দিয়ে ঢাকা থাকে। পুকুরে জলের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে, এরা কি-ভাবে পা দিয়ে চলাফেরা করে, তা চোখে দেখা যায়। পায়ের পাশ দিয়েই শামুকের মুখ বেরিয়ে আসে। তখন এদের মুখে বিভিন্ন অঙ্গ দেখা যায়। এদের মাথার উপর থেকে পর-পর দুই-জোড়া শুঁড় থাকে। শুঁড়ের তলায় চোখ থাকে। স্থলের শামুক আকারে বড় ও লম্বাটে। চলার সময়ে দেখা যায়, এদের দেহ বেশ লম্বা ও এদের বড় দুটি শুঁড়ের মাথায় চোখ থাকে। দেহের পাশে চ্যাপটা পা দিয়ে এরা মাটিতে ও ছোট ছোট উদ্ভিদের উপর দিয়ে চলাফেরা করে। জলের শামুক ও স্থলের শামুকের আকৃতির প্রভেদ এবং চোখের অবস্থিতি—ভালোভাবে দেখলেই, এদের চিনে নিতে অসুবিধে হয় না।



৩৭নং চিত্র—মাকড়সা।

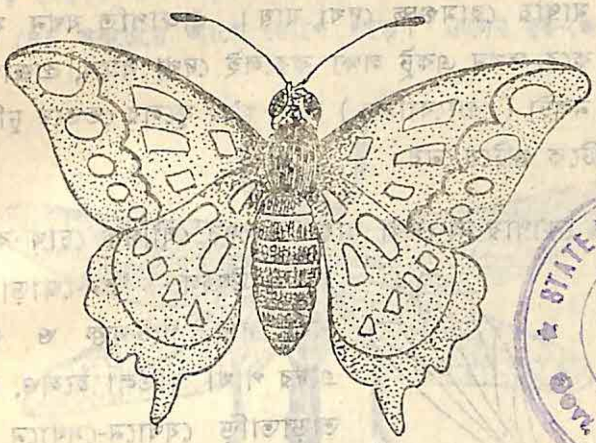


৩৮নং চিত্র—জলের শামুক।

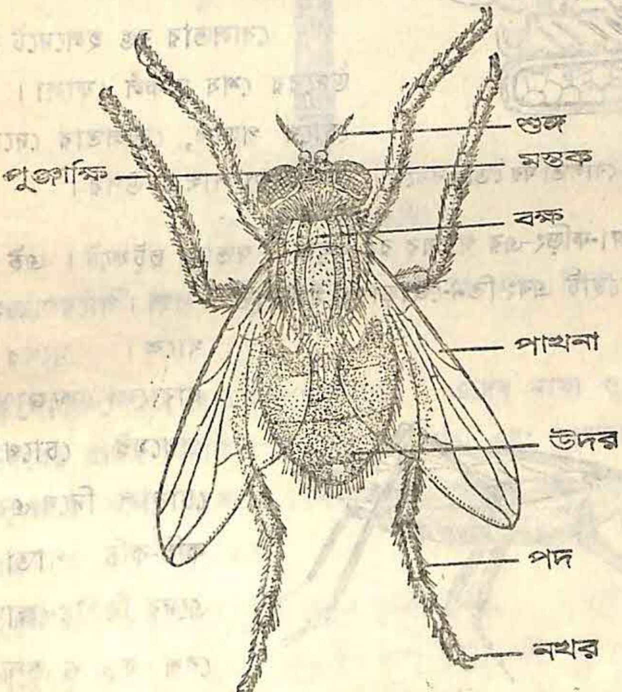


৩৯নং চিত্র—স্থলের শামুক।

প্রজাপতি আমাদের উপকারী প্রাণী। নানারকমের প্রজাপতির মধ্যে কয়েকটির বৈশিষ্ট্যের মিল দেখা যায়। এদের শরীরে তিনটি ভাগ



৪০নং চিত্র—প্রজাপতি।



৪১নং চিত্র—মাছির বহিরাকৃতি।

আছে ; যেমন—মাথা, বুক আর পেট। এদেরও তিন-জোড়া গাঁট-যুক্ত পা আছে। দুই-জোড়া পাতলা সুন্দর পাখা প্রজাপতির বৈশিষ্ট্য। এদের শুঁড়-দুটির মাথায় রোমগুচ্ছ দেখা যায়। প্রজাপতি যখন ফুল থেকে মধু শোষণ করে, তখন একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, প্রজাপতি তার মুখের সরু নলটা (প্রোবোসিস্) লম্বা ক'রে ফুলের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, আবার সেটিকে গুটিয়ে নেয়।

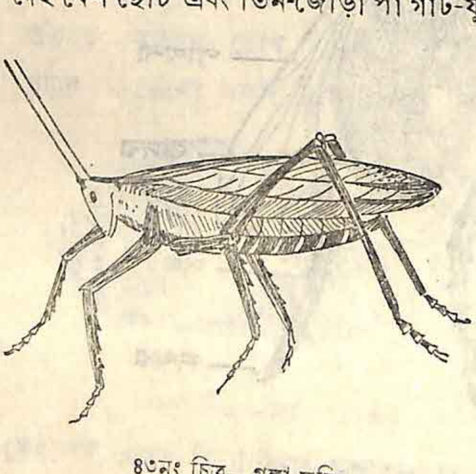
মাছি কোথায় না দেখা যায়। এদের যৌগিক চোখ বা পুঞ্জাক্ষি বড় ও উজ্জ্বল। তিন-জোড়া পা এদের বেশ লম্বা, গাঁট-যুক্ত ও শুঁয়া-পূর্ণ। এদের পাখা পাতলা হলেও, মাছি খুব তাড়াতাড়ি যেখানে-সেখানে ওড়া-বসা করতে পারে।



৪২নং চিত্র—বোলতা ঘর তৈরি করছে।

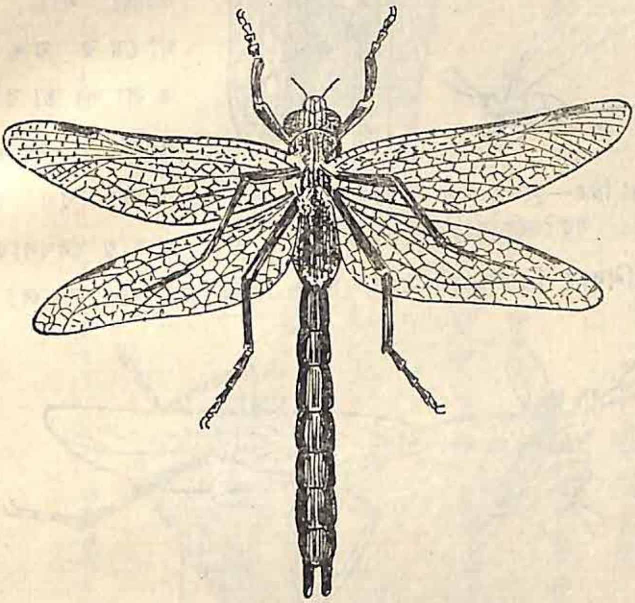
বোলতার রঙ হলদেটে। এদের উদরের শেষ অঞ্চল ফোলা। সহজেই চোখে পড়বে, বোলতার দেহের চেয়ে বেশী-লম্বা পাখার উপর।

গঙ্গা-ফড়িং-এর গায়ের রঙ সবুজ ও স্বভাবে ছট্‌ফটে। এই পতঙ্গটির দেহ বেশ ছোট এবং তিন-জোড়া পা গাঁট-যুক্ত ও লম্বা। পায়ে সরু-সরু কাঁটা থাকে। মুখের পাশে ধারালো একজোড়া চোয়াল প্রথমেই চোখে পড়ে। চোয়াল দিয়ে এরা গাছের কচি-কচি পাতা খায়। এদের দ্বিতীয়-জোড়া পাখা বেশ বড় ও সুন্দর শিরা-উপশিরায় ভরা। এরা ভালো উড়তে পারে।



৪৩নং চিত্র—গঙ্গা-ফড়িং।

পুকুরের ভেতরকার জলজ গাছের উপর ও পুকুরের ধারের উদ্ভিদের উপর উড়ে বেড়ায় জল-ফড়িং। এদের মাথা, বুক ও পেট মিলিয়ে লম্বা নলাকার দেহ সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। এদের দুই-জোড়া পাখাও



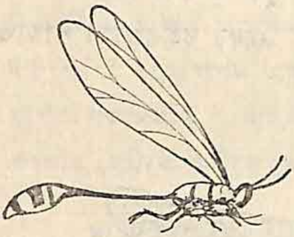
৪৪নং চিত্র—জল-ফড়িং।

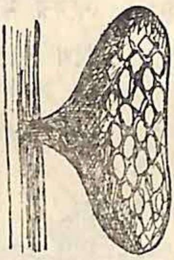
বেশ লম্বা, প্রতিটি সমান আকারের ও পাতলা এবং শিরা-উপশিরায় পূর্ণ।

কুমোরে-পোকা দেখলেই চেনা যায়। এদের মাথা ও বুক স্থূল, কিন্তু উদরের প্রথম অর্ধেকটা সরু নলের মতো এবং শেষভাগ আবার মোটা কুঁজোর মতো আকার নেয়। এদের গায়ের রঙ ফিকে হলদে, বোলতার মতো এত গাঢ় নয়।

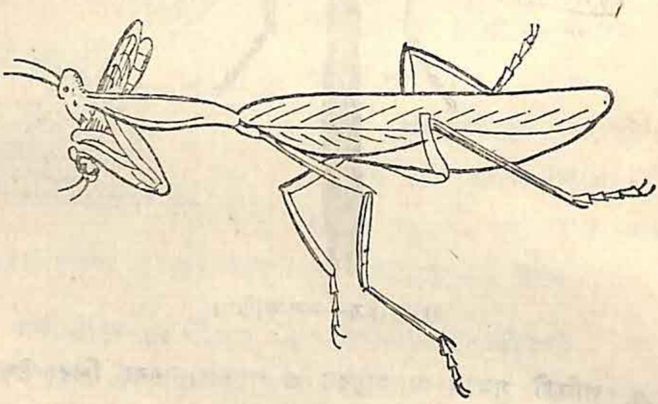
বেশ লম্বা ও মজবুত ফড়িং হচ্ছে ডাইন-ফড়িং। একবার দেখলেই এদের পরিচয় পাওয়া যায়। এদের চোখ বড়, যৌগিক ও বৃন্ত-যুক্ত। প্রথম-জোড়া পা শক্ত, গাঁট-যুক্ত ও অসংখ্য কাঁটা-পূর্ণ। এরা মাথা ও বুক তুলে, প্রথম পা-জোড়া অদ্ভুতভাবে বেঁকিয়ে শিকারের সন্ধানে

এদিক-ওদিক তাকায়। অন্য জাতের ফড়িং এদের খাদ্য। পায়ের কাঁটায় গেঁথে নিয়ে, এরা পরে জ্যান্ত ফড়িংকে আস্তে-আস্তে খায়। এদের গায়ের রঙ কচি কলাপাতার মতো সবুজ। দ্বিতীয়-জোড়া পাখা বেশ লম্বা ও পাখায় দেখবার মতো শিরা-উপশিরার বিন্যাস। তাই চোখ দিয়ে একবার দেখলেই এদের চিনতে মোটেই অসুবিধে হয় না।



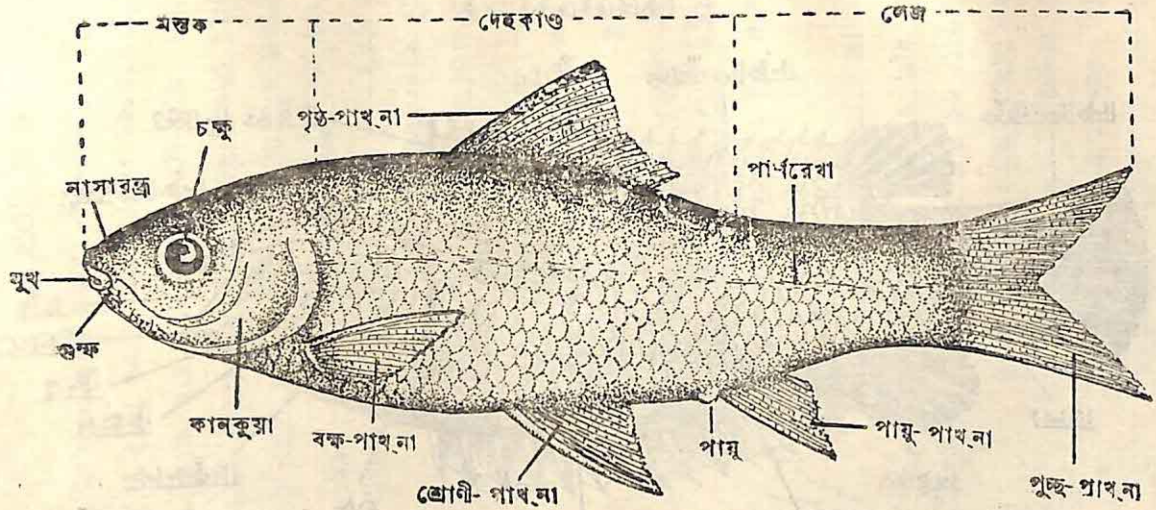


৪৫নং চিত্র—কুমোরে-পোকা মুখে মাটি নিয়ে ঘর তৈরি করতে যাচ্ছে।

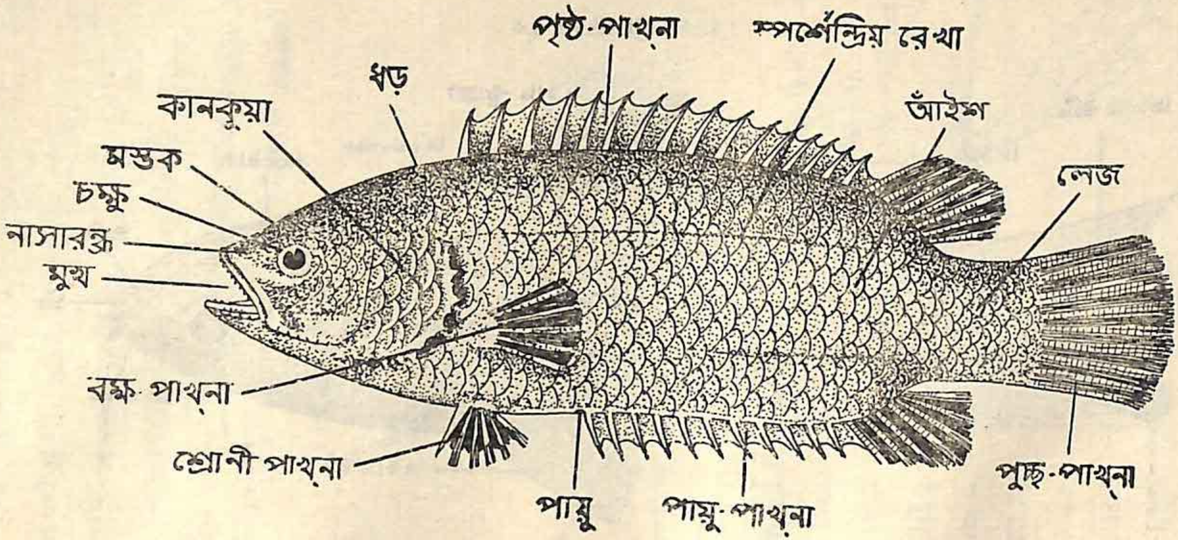


৪৬নং চিত্র—ডাইন-ফড়িং।

বইয়ের পোকা বা সিলভার-ফিশ পুরোনো বইয়ের মধ্যে দেখা যায়। এদের গায়ের রঙ রূপোর মতো। দুই-জোড়া শুঁড়ের মধ্যে লক্ষ্য ক'রে দেখা যায় প্রথমটি ছোট ও দ্বিতীয়টি বেশ লম্বা। তিন-জোড়া পা থাকলেও তা ক্ষীণ ও ছোট। লক্ষ্য করার মতো এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—পেটের শেষে পাঁচটি লেজের মতো উপাঙ্গ। মাঝেরটি সবচেয়ে বড়, এইটিই লেজ; বাকী চারটি লেজের মতো সরু অঙ্গকে 'সারসি' বলে। হ্যাণ্ড-লেন্স দিয়ে দেখলে, এদের দেহে চওড়া ও চকচকে আঁশ দেখতে পাওয়া যায়।

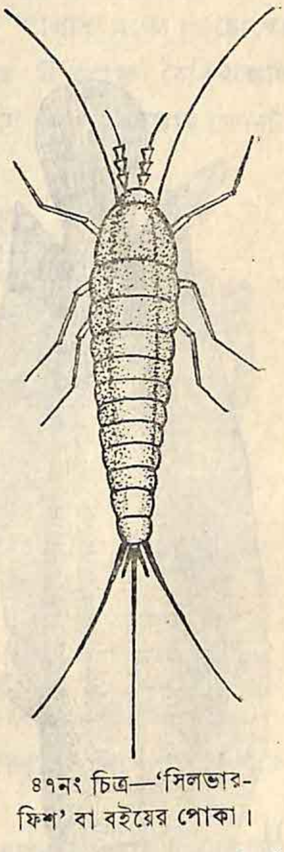

মস্তক
দেহকাণ্ড
লেজ
পৃষ্ঠ-পাখ্না
চক্ষু
নাসারন্ধ্র
পার্শ্বরেখা
মুখ
গুম্ফ
কান্‌কুয়া
বক্ষ-পাখ্না
শ্রোণী- পাখ্না
পায়ু
পায়ু- পাখ্না
পুচ্ছ- পাখ্না

রুই মাছের বহিরাকৃতি।


পৃষ্ঠ-পাখ্না
স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা
ধড়
কানকুয়া
আঁইশ
মস্তক
লেজ
চক্ষু
নাসারন্ধ্র
মুখ
বক্ষ-পাখ্না
শ্রোণী পাখ্না
পায়ু
পায়ু-পাখ্না
পুচ্ছ-পাখ্না

কই মাছের বহিরাকৃতি।

মাছ-এর বহিরাকৃতি একরকমের হয় না। রুই মাছের আকারের সঙ্গে শিঙি বা কই মাছের মিল কম। আবার সরু, লম্বা বান মাছের চেহারা একেবারেই আলাদা। রুই মাছ-এর সমান চেরা লেজ-পাখনা, পিঠের পাখনা ও দুই চোয়ালের কোণে সরু অঙ্গ খুবই স্পষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখলে, অনেক মাছের মধ্যে রুই মাছ থাকলে, সেটি সহজে চেনা যায়।

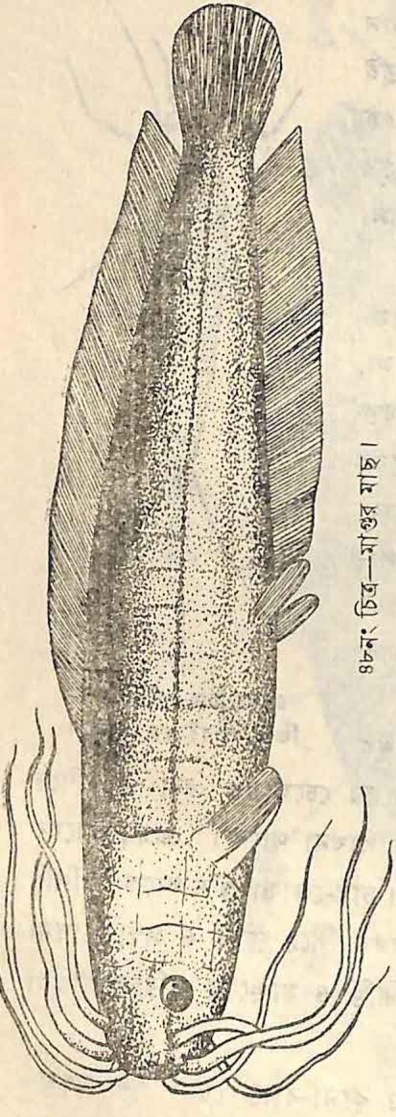


৪৭নং চিত্র—'সিলভার-ফিশ' বা বইয়ের পোকা।

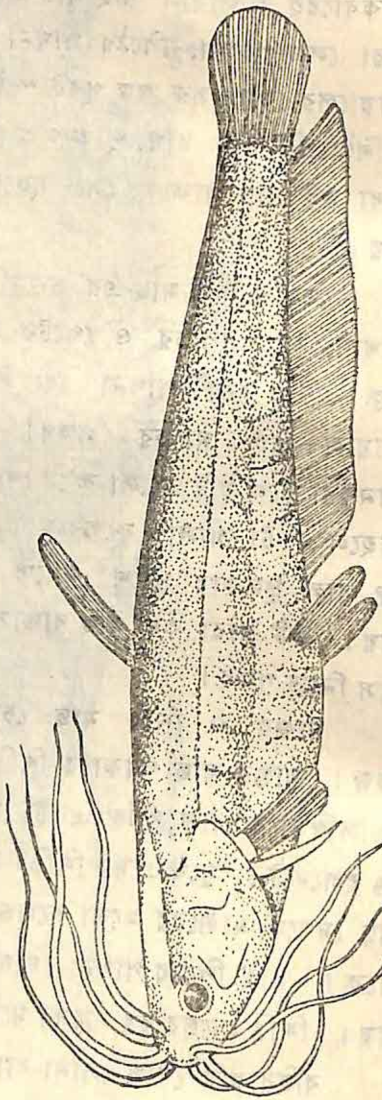
তেমনি কই মাছ-এর চওড়া লেজ-পাখনা, অদ্ভুত পিঠের ও পেটের পাখনা, শক্ত কাঁটার শ্রোণী-পাখনা এবং দাঁত-যুক্ত চোয়াল—এই মাছের লক্ষণ। এদের কানকুয়া তুলে যদি ভালো ক'রে দেখা যায়, তাহলে একটা গোলাপ ফুলের মতো লালা-যন্ত্র লাল ফুলকার পাশে দেখতে পাওয়া যায়। এটি দ্বারা কই মাছ বাতাস থেকে শ্বাস নিতে পারে।

মাগুর ও শিঙি মাছ চেনা খুব সহজ। মাগুর মাছ আকারে শিঙি মাছের চেয়ে বড় এবং এর পিঠে লম্বালম্বিভাবে লেজ পর্যন্ত একটা টানা পাখনা থাকে। এদের গায়ের রঙ হলদেটে। মুখে এদের শিঙির মতো চার-জোড়া শুঁড় থাকে। শিঙি মাছ দেখতে মাগুরের মতো হলেও, এদের পিঠে ছোট ও লম্বা পাখনা থাকে। তাই পিঠের পাখনা দেখেই শিঙি ও মাগুরের পরিচয় পাওয়া যায়। শিঙি মাছের রঙ সীসের মতো।

বহিরাকৃতি দেখে সোনা-ব্যাঙ ও কুনো-ব্যাঙ চেনা খুব সহজ। সোনা-ব্যাঙ আকারে কুনো-ব্যাঙের চেয়ে বেশ বড়। এদের পায়ের আঙুলগুলি চামড়ার পর্দা দিয়ে জোড়া। চামড়া মসৃণ, কোন গুটি



৪৮নং চিত্র—মাগুর মাছ।



৪৯নং চিত্র—শিঙি মাছ।

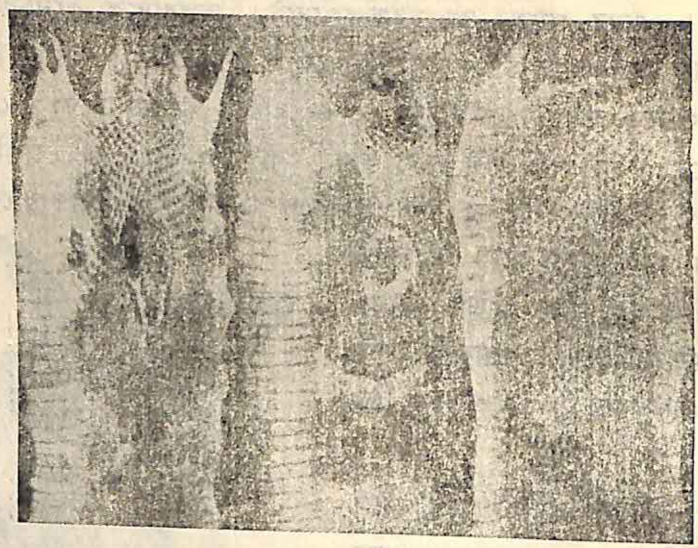
নেই। এদের গায়ের রঙ সবুজ-হলদেটে। অপরদিকে কুনো-ব্যাঙ-এর পায়ের আঙুলগুলি চামড়ার পর্দা দিয়ে সামান্য জোড়া। সারা পিঠ ও গা গুটিতে ভরা। চোখ-দুটি বড় ও বেরিয়ে আসার মতো। চোখের পেছনে একটি বড় গ্রন্থি দেখা যায়। ব্যাঙের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ভালো ক'রে দেখলেই, যে-কোন পরিবেশে বা যে-কোন অবস্থায় কোন্‌টা সোনা বা কোন্‌টা কুনো তা সহজে চেনা যায়। তা ছাড়া, সোনা-ব্যাঙের পিঠের উপর লম্বালম্বি একটা দাগ দেখা যায়। (১৭ ও ১৮নং চিত্র দেখ।)



৫০নং চিত্র—গিরগিটি।

ঝোপে-জঙ্গলে ও গাছের ডালে গিরগিটি ঘুরে বেড়ায়। এদের লেজ খুব লম্বা ও দেহের আকারের চেয়ে বড়। এদের পিঠে সমান্তরাল-ভাবে কাঁটা থাকে। চোখ দিয়ে ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের আঙুলে বক্র ও তীক্ষ্ণ নখ থাকে। গিরগিটির মুখটির রঙ সাধারণতঃ সামান্য লালচে হয়।

গোখুরা ও কেউটে পশ্চিমবঙ্গের বিষাক্ত সাপ। এরা ফণা খুলে, মাথা তুলে দংশন করে। এরা একই প্রজাতির সাপ। গোখুরার ফণার ওপর এক-জোড়া খড়মের দাগ থাকে ও খড়মের মাথা-দুটো দুই পাশের ফণার ওপর থাকে। অপরদিকে কেউটের ফণার ওপর একটি মাত্র খড়মের দাগ বা শুধু একটি গোলাকার চিহ্ন থাকে। তাই একটু লক্ষ্য করলেই এদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে। সারা গায়ে চাঁদের মতো গোল-গোল দাগে ভরা একধরনের সাপ গৃহস্থের বাড়ির বাগানে, গোয়াল-ঘরে ও আশেপাশে দেখা যায়। এটি অতি বিষাক্ত চন্দ্রবোড়া সাপ। এই সাপ ডিম পাড়ে না, বাচ্চা দেয়। জুন মাসে



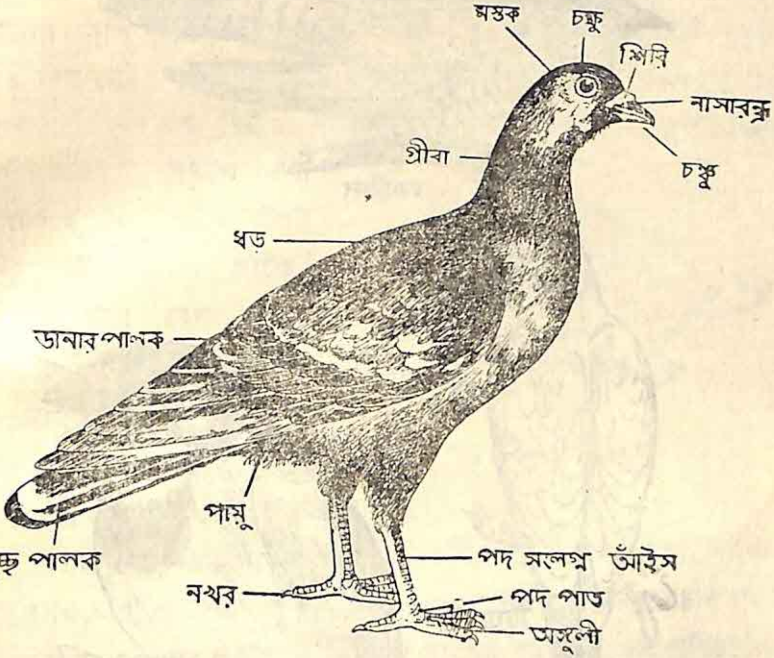
৫১নং চিত্র—গোখুরা ও কেউটে সাপের চামড়া।



৫২নং চিত্র—চন্দ্রবোড়ার চামড়া কেটে বিষের থলি ও বিষ-দাঁত দেখানো হয়েছে।



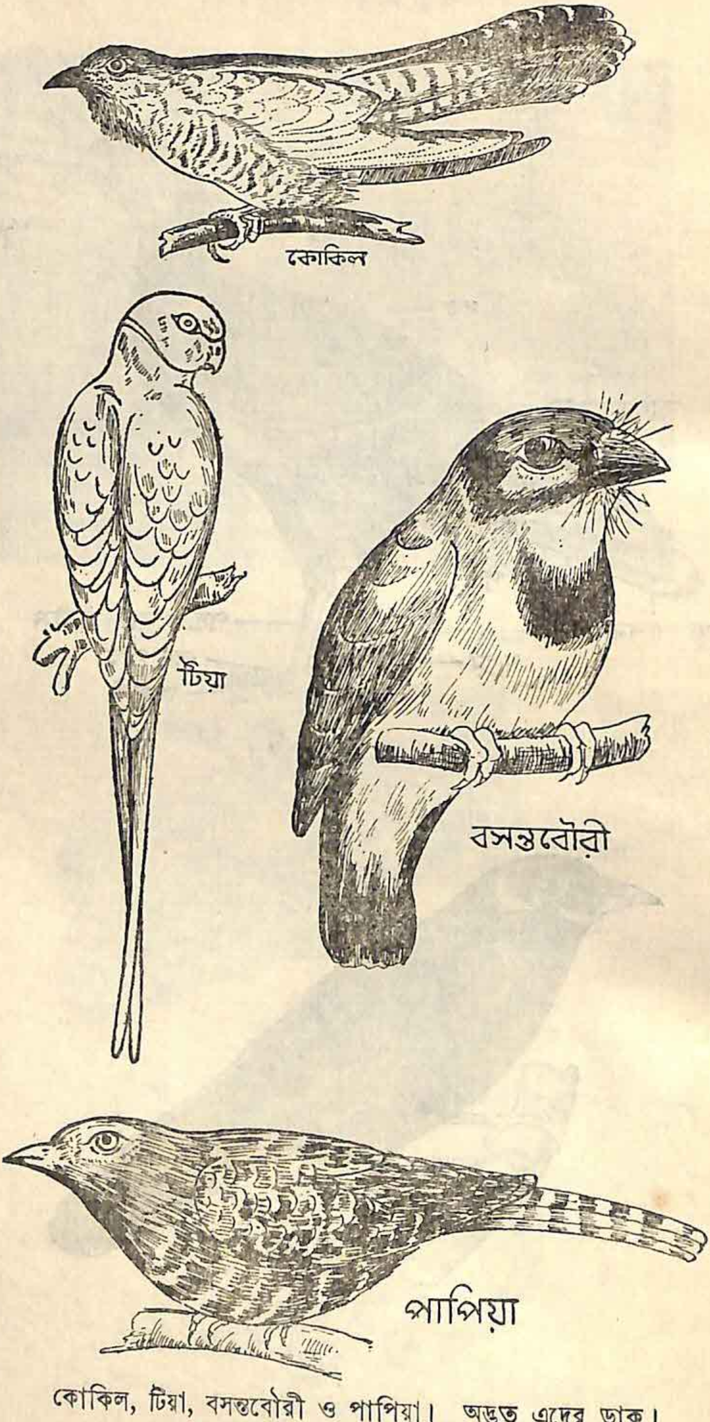
৫৩নং চিত্র—ঢোঁড়া সাপ।



পায়রার বহিরাকৃতি।

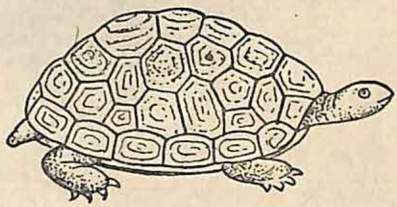


ময়না



কোকিল, টিয়া, বসন্তবৌরী ও পাপিয়া। অদ্ভুত এদের ডাক।
শুধু কানে শুনে বলতে পারা যায়, কোন্‌টা কী পাখি।

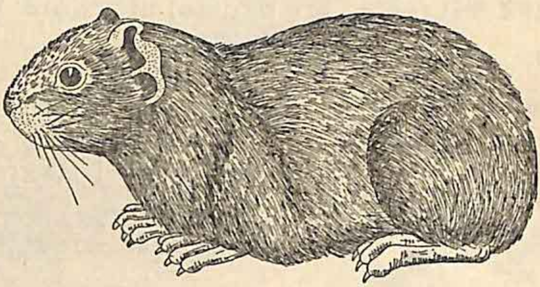
একটি স্ত্রী-চন্দ্রবোড়া এক-এক ক'রে ৯৭টি বাচ্চা দেয়। বাচ্চারাও বিষাক্ত। লাউডগা সাপ সরু ও সবুজ। রঙই লাউডগাকে চিনিয়ে দেয়। এদের বিষ নেই। ঢোঁড়া সাপ পুকুরে বাস করে এবং রঙ-বেরঙের দেখতে। এদের ফণা নেই। মাছ ও ঢোঁড়া সাপ ছাড়াও পুকুরে কচ্ছপ দেখা যায়। দেখতে এরা গোলাকার ও পিঠের উপর একটা বড় ঢাকনা থাকে। মাথা ও গলা বেশ লম্বা। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এরা মাথা ও গলা ঢাকনার ভেতর থেকে বার করতে পারে, আবার দরকার হলে ভেতরে ঢুকিয়ে নেয়।



৫৪নং চিত্র—কচ্ছপ।

কাক, কোকিল, পায়রা, হাঁস, মুরগি, বক, কাদাখোঁচা, ময়না, টিয়া, বসন্তবৌরী, পাপিয়া প্রভৃতি নানারকমের পাখি আমাদের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব পরিচয় আছে। এই পরিচয়টুকু ঠিকমতো জানা থাকলে এদের চেনা খুবই সহজ। কাক দেখতে কালো এবং তার ঠোঁট মজবুত ও লম্বাটে। পুরুষ-কোকিলও কালো। এদের লম্বা ও ঝুলে-পড়া লেজ, লাল চোখ ও বড় মাথা থাকায় কাক ও কোকিলের প্রভেদ ধরা পড়ে। স্ত্রী-কোকিল আকারে কাকের চেয়ে অনেক ছোট। পায়রার মাথার গড়ন, ঠোঁটের পেছনে স্থূল মাংসল-চিহ্ন, সুন্দর লম্বা লেজের পালক ও সুন্দর মজবুত ডানা—এদের নিজস্ব পরিচয়। ময়নার চোখের পেছনে সাদা বা হলদে দাগ ও ঠোঁটের কোণে সাদা বা হলদে দাগ—এই-দুটি বিশেষত্বই ময়নার নিজস্ব পরিচয়। তেমনি হলুদ রঙের বসন্তবৌরী। এদের কালো বেড়-দেওয়া চোখ ও ঠোঁটের উপরে সরু সরু পালক চোখে পড়ে। গিনিপিগের কানের পাতা, গোঁফের লোম, সামনের সুচালো দুই জোড়া দাঁত, পায়ের আঙুলের গড়ন—এগুলি দেখলেই জীবটি যে গিনিপিগ তা সহজে চেনা যায়। তেমনি চেনা যায় কাঠবেড়ালিকে। এদের পিঠের ওপর লম্বা লম্বা সাদা-কালো

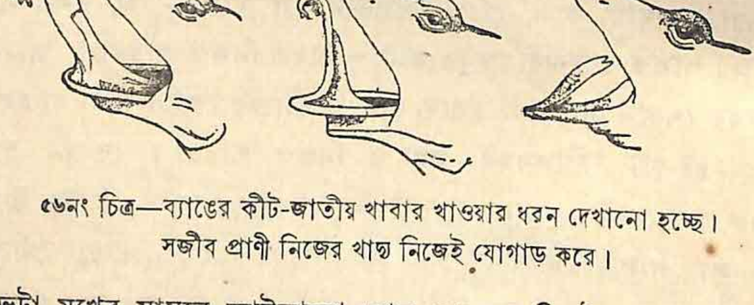
দাগ ও দেহের সমান লোমশ এবং ফোলা লেজ যে-কোন লোকের চোখে পড়বেই। তাই চোখ দিয়ে দেখে অনেক সজীব বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়।



৫৫নং চিত্র—গিনিপিগ বা 'ল্যাবরেটরি-প্রাণী'।

প্রকৃতিগত পার্থক্যঃ সজীবের সজীবতা বজায় থাকে তার কাজের মধ্যে। বিভিন্ন জীব নানা ধারায় জীবনধারণের জন্য কাজ করে, যেমন—খাদ্য গ্রহণ করা, চলাফেরা করা ও নিজেদের বংশ-বৃদ্ধি করা, ইত্যাদি।

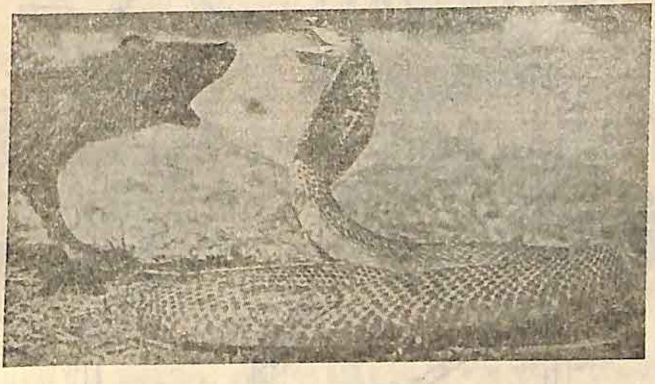
(ক) **খাদ্যগ্রহণ-পদ্ধতি** বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন রকম। ব্যাঙ তার জিভ উলটিয়ে জীবন্ত কীটের উপর চাপিয়ে দিয়ে জিভটি আবার মুখের ভেতর কীটসমেত টেনে নেয়। এটি ব্যাঙ এইজন্যই পারে যে, ব্যাঙের



৫৬নং চিত্র—ব্যাঙের কীট-জাতীয় খাবার খাওয়ার ধরন দেখানো হচ্ছে। সজীব প্রাণী নিজের খাদ্য নিজেই যোগাড় করে।

জিভটা মুখের সামনে আটকানো আর পেছনের দিকটা খোলা। ফলে ব্যাঙ সমস্ত জিভটাই বাইরে বের করতে পারে। জিভের ডগায় রসগ্রন্থি থাকায়, ব্যাঙ চট্ ক'রে কীট আটকে রাখতে পারে। এতেই বোঝা

যায়, ব্যাঙের খাদ্য-শিকারের যন্ত্র হচ্ছে জিভ। বাড়ির দেওয়ালে টিকটিকি চ'লে বেড়ায়। এরাও ছোট ছোট পোকা ও পতঙ্গ জ্যান্ত ধ'রে খায়। ধীরে ধীরে এরা শিকারের কাছে এগিয়ে যায়। তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে শিকারকে আড়াআড়িভাবে মুখ দিয়ে ধরে এবং বার বার মাথা ঝাঁকানি দিয়ে শিকার চিবিয়ে মুখে পুরে নেয়। সাপ সোজাসুজি ব্যাঙের মুখটা চেপে ধরে। চট্ ক'রে গিলতে পারে না। এই সময় ব্যাঙ একটা চাপা আওয়াজ করে। বর্ষাকালে এই আওয়াজ প্রায়ই শোনা যায়। ব্যাঙটিকে সাপ ধীরে ধীরে গিলে ফেলে। ময়ূর সাপ খায়। সাপে ও ময়ূরে লড়াই দেখবার মতো। সাপ যতবার ময়ূরকে ছোবল দেয়, ময়ূর তার ডানা এগিয়ে দেয়। ফলে, সাপ তার ডানার পালকের উপর ছোবল দেয়। ছোবল মারার পরেই সাপের মাথাটি ময়ূর তার তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে। ফলে, সাপ মারা যায়। নেউল বা বেজির সঙ্গে সাপের খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধ। নেউল তার গায়ের লোম ফুলিয়ে সাপের ছোবল এড়ায়। নেউল খুব চট্‌পটে ও তার লম্বা

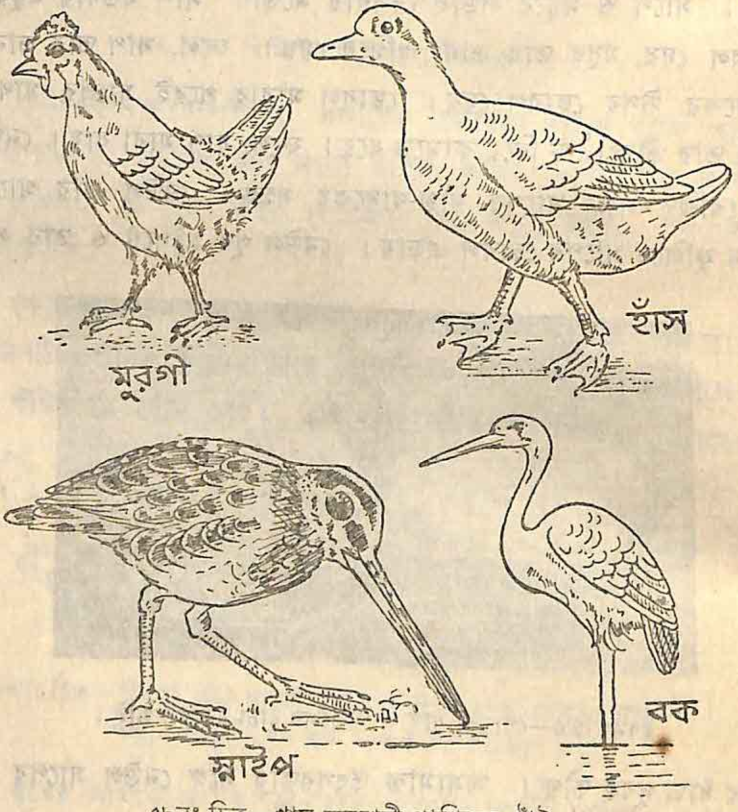


৫৭নং চিত্র—গোখুরা সাপ ও নেউলের বাঁচা-মরার লড়াই।

মুখের দাঁত খুবই তীক্ষ্ণ। অসামান্য তৎপরতার সঙ্গে নেউল সাপের মুখ চেপে ধ'রে দাঁত দিয়ে দেহটিকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেয়।

পাখির খাবার নানারকমের, যেমন—গাছের ফল, ছোলা, গম, মাছ, পোকা-মাকড়, ইত্যাদি। কেউ আবার ছোঁ মেরে ইঁদুর, পাখির

বাচ্চা ও ব্যাঙ খায়। তাই খাদ্যগ্রহণ-পদ্ধতি অনুযায়ী পাখিদের ঠোঁটও নানারকমের। মাছরাঙা পাখির ঠোঁট লম্বা, তীক্ষ্ণ কাঁচির মতো। ঝপ্ ক'রে জলে ডুবে ঠোঁটে আড়াআড়িভাবে মাছ ধ'রে এরা উড়ে যায়। কাঠঠোক্‌রা পাখি গাছের গুঁড়ির ভেতর থেকে পোকা বের ক'রে খায়। তাই এদের ঠোঁট খুব শক্ত ও তীক্ষ্ণ। ফল ঠুক্‌রে খায়, তাই টিয়ার ঠোঁট বাঁকানো ও শক্ত। বাজপাখির পায়ের বাঁকানো, শক্ত ও তীক্ষ্ণ নখ—তার শিকারের যন্ত্র। পায়ের নখ দিয়ে এরা শিকার ধ'রে ঠোঁট দিয়ে ঠুক্‌রে খায়। কুকুর তরল পদার্থ জিভ দিয়ে চেটে খায়, কিন্তু কঠিন

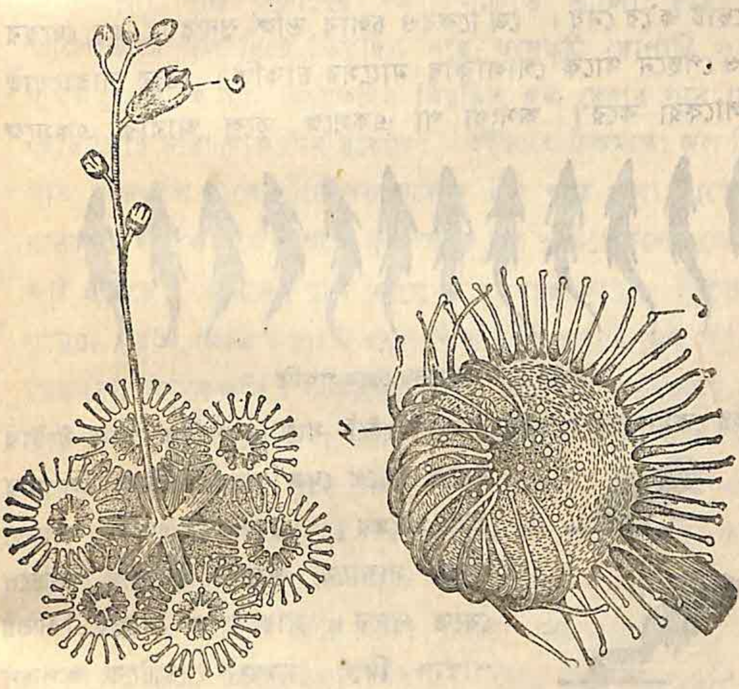


৫৮নং চিত্র—খাদ্য অনুযায়ী পাখিদের ঠোঁট।

পদার্থকে চিবিয়ে টুকরো করবার জন্য শক্ত দাঁতও তার আছে। গোরু, ছাগল—দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খায়। হনুমান, মানুষ—তাদের হাত দিয়ে

খাদ্য ধ'রে খায়। গাছ তার মূল মাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। প্রধান মূল থেকে প্রচুর শাখা-প্রশাখা ও মূল বের হয়ে মাটির অনেকটা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এরাই মাটি থেকে জল-সমেত খাদ্যরস টেনে নিয়ে সমগ্র গাছকে খাদ্য যোগায়। গাছের পাতা বাতাসের ও সূর্যের আলোর সাহায্যে শ্বেতসার খাদ্য তৈরি ক'রে গাছকে খাদ্য যোগায়।

সূর্যশিশির উদ্ভিদ্ তার শুঁয়া দিয়ে কীট-পতঙ্গ ধরে। রাস্নার ঝোলানো মূল বাতাস থেকে জল টেনে নিয়ে গাছকে যোগান দেয়।

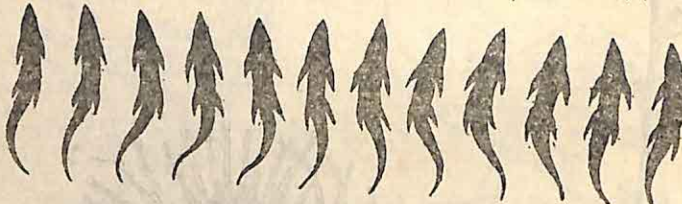


৫৯নং চিত্র—বামদিকে সূর্যশিশির উদ্ভিদ্ ও ডানদিকে সূর্যশিশিরের একটি পাতা। ১, শুঁয়া ; ২, পতঙ্গ ; ৩, সূর্যশিশিরের কুঁড়ি।

মশা মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে ক্ষত তৈরি ক'রে রক্ত শোষণ করে। এর জন্যে এদের মুখে আটটি লম্বা-লম্বা অঙ্গ দেখা যায়। ছারপোকা, উকুন ও চাম (কণ্ডুকীট) তাদের মুখের অঙ্গ দিয়ে মানুষের দেহ থেকে রক্ত টেনে নিয়ে নিজেদের খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। জোঁক তার

ধারালো চোয়াল গোরু, মোষ ও মানুষের দেহে বিঁধিয়ে রক্ত শোষণ করে। রক্তই এদের খাদ্য। শিশু মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়। কুকুর, বেড়াল থেকে সিংহ পর্যন্ত সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর শিশুরা মানুষের মতো মায়ের বুকের দুধ খেয়ে বড় হয়। পাখিদের শিশু-অবস্থায় মায়েরা নিজের ঠোঁট শিশু-পাখির ঠোঁটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে খাবার খাওয়ায়।

(খ) **চলন-পদ্ধতি** বিভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কেঁচো চলার সময়ে সারা দেহে একটি ঢেউ খেলিয়ে চলে। এরা একবার দেহকে প্রসারিত ক'রে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পরে দেহকে সঙ্কুচিত ক'রে আবার ছোট ক'রে নেয়। জোঁকেরও চলার ভঙ্গি সুন্দর। এর দেহের সামনে ও পেছনে থাকে গোলাকার মাংসের চাকতি। তার সাহায্যেই এরা চলাফেরা করে। অসংখ্য পা একসঙ্গে তুলে আবার একসঙ্গে



৬০নং চিত্র—মাছের চলন-পদ্ধতি।

ফেলে কেন্ন কেমন সুন্দর তর-তর ক'রে হেঁটে যায়। শামুক স্থলে হাঁটার সময়ে আগে দেহ থেকে পিচ্ছিল রস বের ক'রে দেয়। তারপর এদের মাংসল পদের সাহায্যে স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে পারে। মাছ তার দেহের বিভিন্ন পাখনা দিয়ে সমস্ত দেহটিকে অপরূপ ভঙ্গিতে নাড়িয়ে জলের মধ্যে সাঁতার কেটে এগিয়ে যায়। ব্যাঙ তার পেছনের পায়ে ভর দিয়ে জোরে লাফ দেয় এবং লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে চলে। পেছনের পা-দুটি ঠিক স্প্রিং-এর মতো কাজ করে। উদ্ভিদ্ তার দেহ এক স্থান থেকে



৬১নং চিত্র—ব্যাঙের চলন-পদ্ধতি।

অন্য স্থানে নিয়ে যেতে পারে না। তবে উদ্ভিদ্ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়া-চাড়া করতে পারে। মূলের দ্বারা মাটির সঙ্গে আটকে থাকার জন্য উদ্ভিদ্ শুধু দেহের বিভিন্ন অংশ নাড়াচাড়া করতে পারে, যেমন—সূর্যের আলোর জন্য গাছের ডাল আলোর দিকে এগিয়ে যায়। আবার জলের আশায় গাছের মূল মাটির ভেতরে প্রবেশ ক'রে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। তাই চলাফেরা বা দেহের অঙ্গাদি নাড়াচাড়া করা সজীবের ধর্ম। কোন জীবের চলাফেরার স্বভাব কী-ধরনের তা চোখে দেখে জানা যায়।

(গ) বৃদ্ধি সজীবের ধর্ম। মাটিতে ভালো সার দিয়ে ও ভালোভাবে জল দিয়ে কিছুদিন পরে কয়েকটি দোপাটি ফুলের বীজ পুঁতে দেওয়া হ'ল। কয়েকদিন নিয়মিত জল দেবার পরে দেখা গেল, ছোট ছোট চারা-গাছ বের হয়েছে। এইভাবে ঠিকমতো জল দিলে দেখা যায় গাছগুলি ধীরে ধীরে বড় হয়েছে এবং পরে দেখা যাবে গাছে ফুল ধরেছে। আরও পরে দেখবে, ফুল থেকে ফল ও পরে ফলের ভেতর বীজের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভিদের বৃদ্ধি চোখে দেখে বোঝা যায়। গৃহস্থের বাড়িতে পায়রা, মুরগি, গোরু ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী প্রায়ই দেখা যায়। পাখি ডিম দেয় অনেকগুলি। তারপর তাতে তা দেয়। কিছুদিন পরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে দেখা যায়। মা-পাখিকে ঠোঁটে ক'রে শিশু-পাখির মুখের মধ্যে খাবার পুরে দিতে দেখা যায়। কিছুদিন পরে দেখবে বাচ্চাগুলি বাসা থেকে বের হয়ে নিজেরাই ঠোঁট দিয়ে খাবার খুঁটে খেয়ে বেড়াচ্ছে। কুকুর একসঙ্গে অনেকগুলি বাচ্চা দেয়। জন্মাবার পর এদের চোখ পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। মা এদের ছেড়ে যায় না। সর্বক্ষণ যত্ন ক'রে স্তনের দুধ খাওয়ায়। ধীরে ধীরে ছানাগুলি বড় হয়ে ওঠে। চোখের পর্দা সরে যায়। পায়ে জোর পেলে এরা হাঁটাহাঁটি সুরু করে। মা-কুকুর এদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়ায়। আরও বড় হয়ে গেলে এরা স্বাধীনভাবে নিজেরাই ঘুরে বেড়ায়।

(ঘ) বংশবৃদ্ধি সজীবের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি। গাঁদা বা দোপাটি ফুলগাছের তলায় প্রায়ই দেখা যায় অনেক গাঁদা বা দোপাটি চারা জন্মেছে। এই চারা-গাছগুলি কোথা থেকে এলো?

আগেই বলা হয়েছে, ফুল থেকে ফল হয়, আবার ফলের ভেতর বীজের সৃষ্টি হয়। সেই বীজই মাটিতে প'ড়ে মাটির সাহায্যে চারা-গাছের উৎপত্তি করেছে। উদ্ভিদ্ তার বীজ দিয়েই বংশ-বিস্তার করে। গাছের ডাল কেটে সেটি মাটিতে পুঁতেও গাছের বংশ-বৃদ্ধি করা যায়। বাতাস, পাখি ও মানুষ, বীজ ও ফল নিয়ে দূর-দূর জায়গায় বয়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। নতুন জায়গায় গাছ আবার জন্মায়। গাছের বিস্তার এইভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। মাছ একসঙ্গে প্রচুর ডিম পাড়ে। কিছু কিছু ডিম জলজ কীট-পতঙ্গ খেয়ে ফেলে। ডিম ফুটলে মাছের পোনা জেলেরা মাটির জল-ভরা হাঁড়িতে ক'রে এদেশ-ওদেশে চালান দেয়। মাছের বংশ-বৃদ্ধি ডিম দিয়ে হয় এবং তাদের বিস্তার জলের মাধ্যমে নানা জলাশয়ে ছড়িয়ে পড়ে। ইঁদুর বছরে অনেকবার বাচ্চা দেয়। প্রতি-বারই একসঙ্গে অনেকগুলি জন্মায়। বাচ্চাগুলি বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ হলে এরাও বাচ্চা দিতে আরম্ভ করে। এইভাবে ইঁদুর বংশ-বিস্তার করে।

(৬) জীবনচক্র—প্রাণীদের জীবনচক্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে তাদের বিষয় অনেক কিছুই জানা যায় এবং তাদের পরিচয়ও পাওয়া যায়। মশা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় দেখতে একরকম, কিন্তু মশার মূককীট বা পিউপা দেখতে একেবারেই অন্য রকমের। তাই মশার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনচক্রের



৬২নং চিত্র—প্রজাপতির জীবনচক্র।
(ক) প্রজাপতির শুঁয়াপোকা-দশা: ১, পদ; ২, উপপদ; ৩, ক্লাপার।
(খ) গুটির ভেতরে মূককীট।
(গ) গুটি খুলে মূককীট দেখানো হচ্ছে।
(ঘ) পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি।

বিবিধ ধারারও পরিচয় জানা দরকার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে প্রকৃতির সজীব বস্তুর প্রতি নজর রাখলে তাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাপতি খুব সুন্দর দেখতে, কিন্তু তাদের শুঁয়াপোকা-দশা চেনা দরকার। কোন্ প্রজাপতি কি ধরনের শুঁয়াপোকা থেকে বেরিয়ে আসে তা ঝোপ-জঙ্গল বা গাছপালার প্রতি নজর রাখলে তাদের বিষয়ে বেশ কিছু জানা যায়। এটি ঠিক উদ্ভিদের বীজের মতো। বীজের পরিচয়ে গাছের পরিচয়। কুমড়োর বীজ যার জানা, সে বিবিধ উদ্ভিদ্-বীজের মধ্য থেকে কুমড়োর বীজ ঠিক চিনতে পারবে। আবার, ঝিঙের বীজ কালো ও তার গায়ে সাদা ছিট-দাগ থাকে। বীজ দেখেই জানতে পারা যায় বীজটি ঝিঙে-উদ্ভিদের। তাই সজীব-এর জীবন-অবস্থার প্রতিটি দশার সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। তা না হলে সজীবের উপর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

শ্রবণের দ্বারা সজীবের পরিচয়

প্রতিটি প্রাণীর গলার আওয়াজ বিভিন্ন। তাই গলার আওয়াজে বা ডাক শুনে প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িতে কোন আত্মীয় এলে তাকে না দেখে, শুধু তার গলার আওয়াজ বা স্বর শুনে তাকে চেনা যায়। গোরুর হাম্বা-হাম্বা ডাক, কুকুরের ঘেউ-ঘেউ, বিড়ালের মিউ-মিউ, ঘোড়ার চিঁহি-ডাক, কাকের কা-কা, কোকিলের কুহু ও চড়ুই পাখির কিচির-মিচির—এগুলি এদের গলার ও ডাকের নিজস্ব পরিচয়। বর্ষাকালে ব্যাঙের গ্যাঙর-গ্যাঙর ডাক শুনে মানুষ অস্থির হয়ে পড়ে। হায়নার ডাক মানুষের কান্নার মতো শোনায়। শিয়ালের হুক্কা-হুয়া, বাঘের ডাক—এদের প্রতিটি আওয়াজের নিজস্বতা আছে। তাই শ্রবণ-শক্তি ভালো থাকলে তার সাহায্যে সজীবের পরিচয় পাওয়া সহজতর হয়।

ঘ্রাণের দ্বারা সজীবের পরিচয়

অন্ধকার ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা বোট্‌কা গন্ধ পেলে। কিসের গন্ধ! আলো জ্বেলে দেখলে একটা বড় ছুঁচো ঘর থেকে পালিয়ে গেল। বোট্‌কা গন্ধটা ছুঁচোর গায়ের গন্ধ। এই গন্ধই ছুঁচোর পরিচয়।

ঘ্রাণশক্তি প্রবল থাকলে, সেটি ব্যবহার ক'রে অনেক সজীবের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা নিশ্চয় জানে যে, বিভিন্ন প্রাণীর দেহে নিজস্ব একটা গন্ধ আছে, যেমন—কুকুরের গায়ের গন্ধ, আরশোলার গন্ধ, ছারপোকার গন্ধ, বাঘের গায়ে পচা মাংসের গন্ধ। আবার ফুল ও ফলের গন্ধে কোন্ গাছের ফল বা ফুল তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। রজনীগন্ধা, বেল, গোলাপ, জুঁই, গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুলের ঘ্রাণ নিলে বোঝা যায় কোন্ গাছের ফুল এগুলি। আমের গন্ধ, লেবুর গন্ধ, বেলের গন্ধ—এইসব ফল তাদের গন্ধে নিজেদের পরিচয় দেয়। তাই ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ হলে সহজেই সজীব বস্তুর সঙ্গে পরিচয় পাওয়া যায়। আবার গাছের পাতা বা কাণ্ডের গন্ধ শুঁকে বলা যায় গাছটির পরিচয়। গাঁদাল, তুলসী, গাঁদাফুল, জুঁই, প্রভৃতি গাছের পাতার নিজস্ব গন্ধ তাদেরকে চিনিয়ে দেয়। মানুষের গায়েরও গন্ধ আছে। প্রতিটি মানুষের গায়ের নিজস্ব গন্ধ আছে। কুকুরের ঘ্রাণশক্তি খুবই প্রবল, তাই কুকুর মানুষের গায়ের গন্ধ শুঁকে মানুষ চিনতে পারে। কোন ব্যক্তির ব্যবহৃত জামা-কাপড় শুঁকিয়ে দিলে, শিক্ষাপ্রাপ্ত কুকুর সেই মানুষটিকে অজ্ঞাত স্থান থেকে বের করতে পারে।

স্পর্শের দ্বারা সজীবের পরিচয়

আমাদের চামড়ার একটি অনুভূতি আছে। জলে হাত দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, জল কতটা ঠাণ্ডা বা গরম। কারও জ্বর হয়েছে, তার গায়ে হাত দিয়ে আমরা বুঝতে পারি জ্বর বেশী না কম। বিছুটি উদ্ভিদের পাতায় হাত দিলেই আমরা বুঝতে পারি এটি বিছুটি। এর পাতার শুঁয়া চামড়ায় লাগলে চামড়া জ্বালা করে ও পরে ফুলে যায়। তেমনি শুঁয়াপোকার গায়ে হাত লাগলেই হাত চুলকোয়। বোঝা যায় শুঁয়াপোকা হাতে লেগেছে। মশা বা মাছি গায়ে বসলেই বুঝতে পারা যায়। মশা হাতের উপর বসেছে ও হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে তাও বোঝা যায়। তাই স্পর্শেন্দ্রিয় সজাগ করলে মানুষ অনেক সজীব বস্তুর অস্তিত্ব ও পরিচয় জানতে পারে। সজীবের গায়ে হাত বুলিয়েও তাদের পরিচয়

জানা যায়। কোন্ প্রাণীর চামড়া খস্খসে, আবার কোন্ প্রাণীর চামড়া নরম বা মসৃণ—সেটি প্রাণীর গায়ে হাত বুলিয়ে জানা যায়। তেমনি কোন্ পাতা পুরু বা পাতলা, কোন্টা শুঁয়া-যুক্ত বা তৈলাক্ত তা পাতার উপর হাত বুলিয়ে বোঝা যায়। কোন্ জিনিসের কতটা ওজন তাও হাতে নিয়ে আন্দাজ ক'রে পরে দাঁড়িপাল্লায় মেপে নিয়ে মিলিয়ে দেখতে-দেখতে হাতের স্পর্শেরও একটা সঠিক ওজনের ক্ষমতা মানুষ অর্জন করতে পারে। স্পর্শের ক্ষমতা অধ্যবসায় ও অনুশীলনের দ্বারা বৃদ্ধি পায়। অন্ধ ব্যক্তিরা স্পর্শেই লেখাপড়া শেখে। তাদের স্পর্শের মাধ্যমে অনুভূতির ক্ষমতা এত প্রবল যে, বস্তুর উপর হাত দিয়েই তারা তার পরিচয় বলতে পারে।

স্বাদের দ্বারা সজীবের পরিচয়

টক, ঝাল, মিষ্টি, তেতো আর কষা—এই পাঁচরকমের স্বাদের গ্রন্থি মানুষের জিভে আছে। তাই কোন বস্তু জিভে ঠেকালে তার স্বাদ বোঝা যায়। স্বাদই জিভের পরিচয়। টক-জাতীয় ফল, যেমন—তেঁতুল, কাঁচা আম, আমড়া, কুল, করম্চা, টম্যাটো, লেবু ইত্যাদি জিভে ঠেকালেই এদের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার তেঁতুলের টক ও আমের টকের মধ্যে প্রভেদটুকুও বোঝা যায়। আবার, ফল পেকে গেলে তার স্বাদও জিভে ঠেকালে জানা যায়। লঙ্কা, লবঙ্গ, গোলমরিচ, আদা প্রভৃতির ঝাল জিভে দিলে শুধু যে এগুলি ঝাল ব'লে মনে হয় তা নয়, কোন্ বস্তুর ঝাল কতখানি তাও জানা যায়। আম, যেমন—ল্যাংড়া, ফজলি ও হিমসাগর—এগুলি সবই মিষ্টি। জিভে দিলে এদের মিষ্টত্ব বোঝা যায় এবং কোন্ আমটার কী স্বাদ তাও বোঝা যায়। হরীতকী বেশ কষা ও বয়েড়াও কষা, কিন্তু এই দুটি শুকনো ফল জিভে দিলে দেখবে এদের কষার মধ্যে স্বাদের পার্থক্য আছে। নিমপাতা, উচ্ছেপাতা, কালমেঘের পাতা, শিউলির পাতা, পলতা পাতা ও থানকুনি পাতা—এরা প্রত্যেকেই স্বাদে তেতো। কিন্তু এই তেতোর মধ্যেও এদের প্রতিটির নিজস্ব একটা স্বাদ আছে এবং সেটি জিভ দিয়ে পরীক্ষা করলেই বোঝা যায়। নিমের

তেতো আর উচ্ছের তেতোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, সেটা জিভে ঠেকালেই বোঝা যায়। সেইরকম নানারকমের মাছের রান্না খাবার সময়ে মুখে দিলেই জিভের দ্বারা কোন্‌টা কী মাছের রান্না তা বোঝা যায়। ইলিশের স্বাদ, রুই মাছের স্বাদ, ভেটকি মাছের স্বাদ ও কই মাছের স্বাদ কি এক? মোটেই নয়—এরা সব মাছ হলেও। ইলিশের নিজস্ব স্বাদের সঙ্গে কই মাছের স্বাদের কোন তুলনা হয় না। এদের নিজস্ব পরিচয় আমরা জিভে ঠেকিয়ে স্বাদের অনুভূতিতে বুঝতে পারি। তেমনি কাঁকড়ার স্বাদ কি চিংড়ির স্বাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে? কাজেই দেখা যাচ্ছে জিভ আমাদেরকে অনেক বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ

উদ্ভিদ্	প্রাণী
১। উদ্ভিদের দেহ শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট হয়।	১। কিছুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ছাড়া সাধারণতঃ প্রাণীদের শাখা-প্রশাখা থাকে না।
২। ছত্রাক ও ব্যাক্‌টিরিয়া ছাড়া অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই সবুজ। এদের কোষে ক্লোরোফিল বা সবুজকণা থাকায় উদ্ভিদের রঙ সবুজ হয়।	২। কিছুসংখ্যক নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও কয়েকটি পতঙ্গের ডানায় সবুজকণা দেখা যায়।
৩। উদ্ভিদের চলনশক্তি নেই। এরা মূলের মাধ্যমে মাটির সঙ্গে আটকে থাকে। এদের আকর্ষ, ফুল, মূল ইত্যাদি সঞ্চালিত হয়।	৩। অধিকাংশ প্রাণীরই চলনশক্তি থাকে।
৪। উদ্ভিদ্ বহিঃ-উদ্দীপকের আকর্ষণে উত্তেজিত হয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন খুব ধীরে ধীরে হয়।	৪। প্রাণীদের স্নায়ুতন্ত্র থাকায়, এরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত নাড়াচাড়া করতে পারে।
৫। উদ্ভিদ্ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বা সবুজকণা, সূর্যের আলো, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সাহায্যে নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে।	৫। প্রাণীদের দেহে সবুজকণা না থাকায়, এরা দেহের ভেতর খাদ্য তৈরি করতে পারে না। এরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল।

উদ্ভিদ্	প্রাণী
৬। উদ্ভিদ্ কঠিন খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এরা অতি তরল ও সরল খাদ্য শোষণ ক'রে দেহের ভেতর কঠিন ও জটিল খাদ্য তৈরি করে।	৬। প্রাণী জটিল ও কঠিন খাদ্য গ্রহণ করে এবং দেহের ভেতর তা তরল ও সরল ক'রে পরিপাক করে।
৭। পাতার ছিদ্র দিয়ে উদ্ভিদ্ অক্সিজেন শোষণ ক'রে শ্বাসকার্য সম্পন্ন করে। এদের পৃথক্ কোন শ্বসনযন্ত্র নেই।	৭। শ্বসন-কার্যের জন্য প্রাণীদের নানাপ্রকারের শ্বসনযন্ত্র থাকে। এর দ্বারা প্রাণী অক্সিজেন শোষণ করে।
৮। উদ্ভিদ্-দেহের রেচনপদার্থ জলের সঙ্গে পাতার ছিদ্রপথে বাষ্পাকারে বের হয় বা কঠিন হয়ে কোষে জমা থাকে।	৮। প্রাণীর রেচনতন্ত্র আছে। দেহের ভেতর থেকে অতিরিক্ত জল ও দূষিত রাসায়নিক দ্রব্য মল, মূত্র বা ঘামের মাধ্যমে বের ক'রে দেয়।
৯। উদ্ভিদের বৃদ্ধিকারী বিপাকীয় কাজ বেশী হয়। তাই এরা প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করতে পারে। এদের বৃদ্ধি মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত দেখা যায়।	৯। প্রাণীদের ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য বেশী হয়। সেজন্য এরা কিছুকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে, এদের বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ ও আয়ু কম।
১০। উদ্ভিদের দেহের বিবিধ অংশ হতে নূতন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বীজের সাহায্যে বংশবৃদ্ধি সাধারণ নিয়ম।	১০। প্রাণী কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদন ক'রে বংশবৃদ্ধি করে।
১১। উদ্ভিদের চোখ, কান, নাক, জিভ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় থাকে না।	১১। অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের চোখ, কান, নাক, জিভ ইত্যাদি ইন্দ্রিয় থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ছোট ছোট স্নায়ু-ইন্দ্রিয় দেখা যায়।
১২। উদ্ভিদের দেহকে কোন জ্যামিতিক নিয়মে ভাগ করা যায় না।	১২। অধিকাংশ উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের দেহকে জ্যামিতিক নিয়মে সমান ভাগে ভাগ করা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

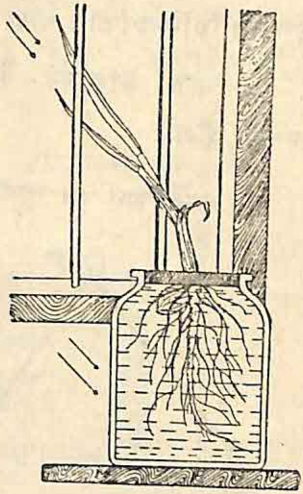
পরীক্ষার মাধ্যমে সজীব বস্তুর পরিচয়

কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ বস্তুর মধ্যে থাকলে, তা দেখে আমরা বস্তুকে সজীব বলি। যেমন—চলাফেরা করা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, খাদ্য সংগ্রহ করা, আলোর দিকে এগিয়ে যাওয়া বা আলোর প্রতি আকর্ষণ, জল ও জলে-মেশা ধাতব পদার্থ শোষণ—এইগুলি সজীবের লক্ষণ। এইসব কাজ করতে হলে জীবের শক্তির দরকার। মানুষ যেমন খাদ্য খায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, কাজ-কর্ম করে—এ-সবের জন্যে শক্তির দরকার। এই শক্তি সজীব বস্তু ও আমরা পাই খাদ্য গ্রহণ ক'রে। খাদ্যই সজীবকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। বীজ ভেজা-মাটিতে প্রথমে মূল বের করে। পরে বীজপত্র বের হয়। মূল মাটি থেকে খাদ্য-মিশ্রিত জল শোষণ করে, আর পাতা বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নিজেই তা জলের সঙ্গে মিশিয়ে শর্করা বা চিনি-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। প্রাণী খাদ্য না পেলে বাঁচতে পারে না। খাঁচার পাখিকে খেতে না দিলে, সে অল্পদিনের মধ্যে মরে যাবে। তাই প্রতিটি প্রাণীর নিয়মিত খাদ্যের দরকার। টবের গাছে জল না দিলে, গাছ শুকিয়ে মরে যাবে। সুতরাং জীবদেহে শক্তি যোগানোর জন্যই খাদ্যের দরকার। জড়বস্তুর আলো, বাতাস, জল বা অন্য কোন খাদ্যের দরকার নেই। এদের জীবনের কোন লক্ষণ নেই। তাই এরা জড় হয়ে পড়ে থাকে এবং এই জড়পদার্থকেই শোষণ ক'রে সজীবের বৃদ্ধি হয়।

সজীবের উপর আলোর প্রভাব

আলো উদ্ভিদের পাতায় সবুজকণা সৃষ্টি করে। আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ্ শর্করা বা চিনি-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে। তাই গাছপালা আলোর দিকে এগিয়ে যায়।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ: একটি আলো-প্রভাবিত জানলার ধারে একটি টব রাখা হ'ল। টবের মাটিতে জল দিয়ে কতকগুলি ভিজে ছোলার বীজ পুঁতে দেওয়া হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার পরে, চারা-গাছের ডালপালা জানলার গরাদের ফাঁকের মধ্যে দিয়ে মুক্ত আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, দেখা যাবে। টবের দিক্-পরিবর্তন করলে, চারা-গাছকেও নতুন ক'রে দিক্-পরিবর্তন ক'রে আবার আলোর দিকে এগিয়ে যেতে দেখা যাবে।



৬৩নং চিত্র—উদ্ভিদ্ আলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত: আলোর আকর্ষণের জন্যই উদ্ভিদ্ জানলা ভেদ ক'রে মুক্ত জায়গায় এগিয়ে যায়। আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ্ নিজের খাবার নিজেই তৈরি করে। আলো উদ্ভিদের দেহে সবুজকণা তৈরি ক'রে সজীবতা আনে।

খোলা মাঠে সবুজ ঘাসের ওপর চারটি ইঁট পর পর সাজিয়ে রাখা হ'ল। এক সপ্তাহ পরে ইঁটগুলি তুলে নেওয়ার পর দেখা যাবে ইঁটের তলাকার ঘাসগুলি সাদা হয়ে গিয়েছে এবং পাতলাও হয়েছে অনেক। আলো না পাওয়ায় ঘাসের এই দশা। আলোর অভাবে ঘাস সবুজকণা তৈরি করতে পারেনি। ঘাসের মধ্যে খাদ্য যা ছিল তা শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে, ঘাস সাদা হয়ে আধমরা হয়ে রয়েছে। আবার, একটা টবের গাছকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে কিছুদিন রাখো, দেখবে গাছটির পাতা সাদাটে হয়ে যাচ্ছে। বেশীদিন এভাবে রাখলে গাছটি মরে যাবে।

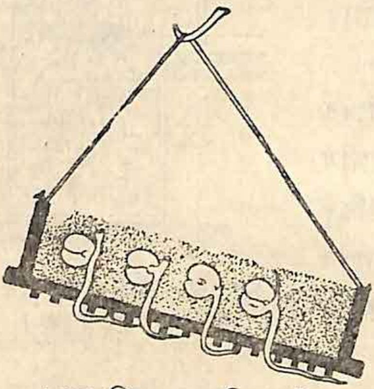
উদ্ভিদের উপর জলের প্রভাব

খরা আমাদের শোনা ও জানা কথা। প্রতিবছরই আমাদের বেশ-কিছু ধান ও শাক-সব্জি বর্ষা বা জলের অভাবে শুকিয়ে যায়। বীজ

জলের প্রভাবে অঙ্কুরিত হয়। উদ্ভিদ্ মাটি থেকে জলে দ্রবীভূত নানারকমের ধাতব লবণ জলের মাধ্যমে মূলের সাহায্যে শোষণ ক'রে নেয়। আবার উদ্ভিদ্ জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে পাতায় চিনি-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।

নিচে উদ্ভিদের উপর জলের প্রভাব বিষয়ে একটি পরীক্ষা দেওয়া হ'ল :

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ : একটি চার-কোণা কানা-উঁচু ট্রে-তে কাঠের গুঁড়ো ভর্তি ক'রে দেওয়া হ'ল। ট্রে-র দু'ধারের আংটায় দড়ি দিয়ে বেঁধে, সূর্যালোকিত দেওয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রাখা হ'ল। ট্রে-খানা এমনভাবে টাঙাতে হবে, যাতে তার একটি কোণ উঁচুতে, আর একটি কোণ নিচুতে থাকে। ট্রে-র নিচের অংশে অনেকগুলি ছিদ্র থাকে। কিছু জলে-ভেজানো ছোলার বীজ ট্রে-র উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। কাঠের গুঁড়োর উপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরে বীজগুলির অঙ্কুরোদ্গম হ'ল এবং দেখা গেল বীজগুলির প্রধান মূল ট্রে-র যেদিকটি নিচু সেইদিকেই এগিয়ে গিয়েছে।



৬৪নং চিত্র—জলবৃত্তির পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে।

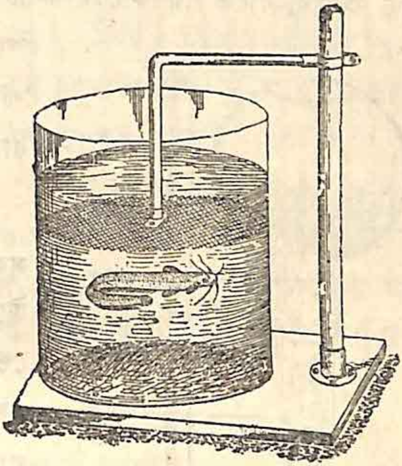
সিদ্ধান্ত : জলের গতি সবসময়ে নিচুর দিকে। তাই ট্রে-র জল ট্রে-র যেদিকটা নিচু সেদিকে জমা হয়েছে। এই জলের টানেই বীজের প্রধান মূলগুলি ট্রে-র নিচু অংশে এগিয়ে গিয়েছে।

সজীবের নিশ্বাস-প্রশ্বাস

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই বাঁচার জন্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস অপরিহার্য। শ্বাসকার্যের সময়ে সজীবের দেহে অক্সিজেন গৃহীত হয় এবং কার্বন

ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিত্যক্ত হয়। এর ফলে দেহের ভেতরকার খাদ্য অক্সিজেন দ্বারা দাহিত হয়। ফলে, সজীব শক্তি পায়।

শ্বাসকার্যের পদ্ধতি সকলের একরকম নয়। উদ্ভিদ্ শ্বাসক্রিয়া চালায় পাতার সাহায্যে তার পত্ররন্ধ্রের ভেতর দিয়ে। স্থলচর প্রাণীরা নাক দিয়ে বায়ুর অক্সিজেন শরীরের ভেতরে টেনে নেয়; ফুস্ফুসের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া চালায়। জলের মাছ শ্বাসক্রিয়া চালায় ফুল্কার সাহায্যে। মানুষ জলে ডুবে গেলে মরে যায়। কারণ, জলের মধ্যে মানুষ শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে না। মাছ ফুল্কার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। কোন আবদ্ধ পাত্রে মাছ রেখে দিলে দেখবে,



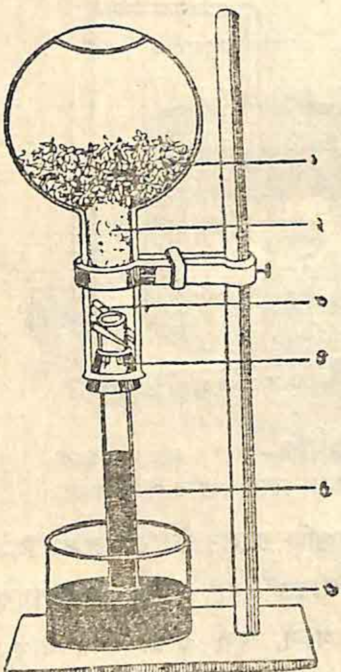
৬৫নং চিত্র—জলের মধ্যে মাছকে চেপে রেখে মারার পরীক্ষা।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাব হলে মাছগুলি জলের উপর ভেসে উঠে খাবি খেতে থাকে এবং শ্বাসক্রিয়া চালাতে না পেরে শেষপর্যন্ত মরে যায়। গরমকালে পুকুরের জল কমে গেলে, জল ভারী হয়ে যায়। তখন জলে অক্সিজেনের অভাব হয়। তাই মাছ পুকুরের উপর ভেসে ওঠে।

শ্বসন-প্রক্রিয়ার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ

কিছু ফুলের কুঁড়ি জলে ধুয়ে, তার সবুজ অংশগুলি ছিঁড়ে ফেলা হ'ল। একটা কাঁচের ফ্লাস্কের ভেতর ঐ কুঁড়িগুলি ভর্তি করো। ফ্লাস্কের গলদেশে তুলোর প্যাড লাগিয়ে, কুঁড়িগুলিকে ফ্লাস্কের মধ্যে আটকে রাখা হ'ল। ফ্লাস্কের মুখে ছিদ্র-যুক্ত কর্ক লাগিয়ে, তার মধ্যে একটা কাঁচের নল প্রবেশ করাও। এখন কর্কটি ফ্লাস্কের মুখ থেকে খুলে, ফ্লাস্কের গলার মধ্যে

কয়েক টুকরো কস্টিক পটাস চিমটার সাহায্যে ঢুকিয়ে দাও। পুনরায় কর্কটিকে ফ্লাস্কের মুখে ভালোভাবে আটকে দাও। কর্ক-সংলগ্ন কাঁচের নলের চারপাশে ভেসলিন লাগিয়ে রাখো। এখন নল-লাগানো ফ্লাস্কটিকে একটি পারদ-পূর্ণ পেট্রিডিস-এর উপর উপুড় ক'রে রাখো। এমনভাবে উপুড় করবে, যাতে সরু কাঁচের নলটির খোলা মুখ পেট্রিডিস-এর তলদেশ স্পর্শ না করে। এইভাবে রেখে, যন্ত্রটিকে 'স্ট্যাণ্ড ও ক্ল্যাম্প' দিয়ে খাড়াভাবে রাখো।



৬৬নং চিত্র—সবাত-শ্বসন-ক্রিয়ার সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের নিষ্কাশন দেখানো হচ্ছে।

(১) কুঁড়ি; (২) তুলোর প্যাড; (৩) কস্টিক পটাসের টুকরো; (৪) ছিদ্রিত নল; (৫) নলের ভিতরের পারদ; (৬) পেট্রিডিস-এর পারদ।

নিরীক্ষা: পারদ প্রথমেই সরু কাঁচের নলের ভেতর কিছু উপরে উঠে যাবে। এরপর পারদ নলের ভেতর ধীরে ধীরে উঠে, অবশেষে নলের ভেতর একটা জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে।

সিদ্ধান্ত: কস্টিকের ধর্ম কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করা। ফ্লাস্কের মধ্যে কস্টিকের প্রবেশমাত্রই কস্টিক ফ্লাস্কের ভেতরকার কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নেয়। কেবলমাত্র ফ্লাস্কের ভেতরকার বায়ুর অক্সিজেন থেকে যায় বা অশোষিতভাবে থাকে। কুঁড়ির শ্বাসক্রিয়ার ফলে ফ্লাস্কের ভিতরকার অক্সিজেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে এবং তার পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং তা কস্টিকের খণ্ড শোষণ ক'রে নেয়। এর ফলে কাঁচের নলের ভেতরকার পারদ উপরে উঠতে থাকে। অবশেষে ফ্লাস্কের সমস্ত অক্সিজেন শেষ হয়ে গেলে, কস্টিক-খণ্ডও

সমস্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নেয়। তাই পারদ-রেখা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে।

এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়—উদ্ভিদ্ শ্বসন-প্রক্রিয়ায় বায়ু হতে অক্সিজেন শোষণ ক'রে তার পরিবর্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে।

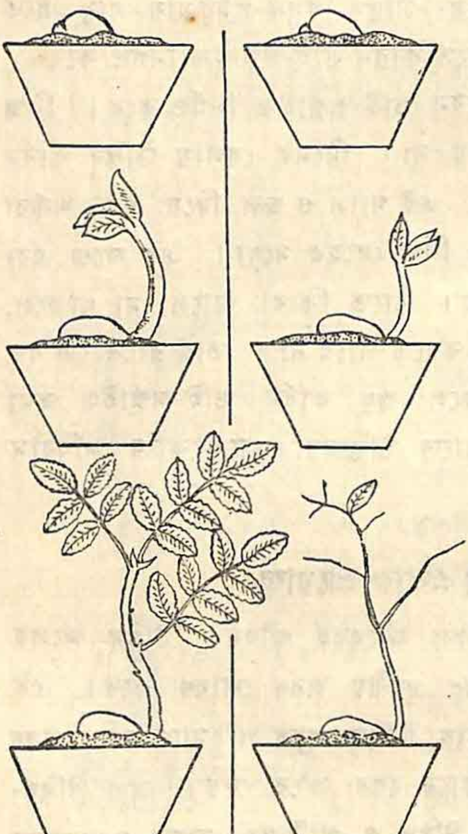
উদ্ভিদ্ শ্বসন-প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে। কিন্তু এই কার্বন ডাই-অক্সাইড নষ্ট হয় না। দিনের বেলায় উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ ক'রে নেয়। এই গ্যাস ও জল দিয়ে এরা শর্করা বা চিনি-জাতীয় খাদ্য তৈরি করে নিজ দেহের মধ্যে। এর জন্যে এরা সবুজকণা ও আলোর সাহায্য নেয়। রাতে কিংবা আলো না থাকলে, উদ্ভিদ্ কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে পারে না। তাই রাতে বড় বড় গাছের তলায় শ্বসন-প্রক্রিয়ার ফলে শুধু কার্বন ডাই-অক্সাইড জমা হয়। শ্বসন-প্রক্রিয়া দিনে ও রাতে উদ্ভিদের কোষে-কোষে অবিরাম চলতে থাকে।

জল সজীবের একান্ত প্রয়োজন

জল শুধু উদ্ভিদের নয়, সকল জীবেরই জীবন। উদ্ভিদ্ জলের মাধ্যমে মাটির মধ্যে থাকা বিবিধ দ্রবণীয় লবণ শোষণ করে। এই লবণ পরিমাণে অতি সামান্য থাকায়, উদ্ভিদ্ প্রচুর পরিমাণে জল শোষণ করে ও তা পাতা দিয়ে বাষ্পাকারে বের ক'রে দেয়। জল উদ্ভিদ্-কোষের সজীবতা রক্ষা করে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের দেহের সবরকমের বিপাকীয় কাজে জল দরকার, অর্থাৎ জলের মাধ্যমেই প্রাণী ও উদ্ভিদ্-দেহে সবরকমের বিপাকীয় কাজ হয়। প্রাণীর রক্ত-সংবহন, পুষ্টি, পরিপাক ও রেচন—সব প্রক্রিয়ায় জলের ভূমিকা প্রধান।

জলের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণঃ দুটি ছোট টবে ভালো মাটি ভ'রে খোলা রোদ-পাওয়া জায়গাতে রাখা হ'ল। চারটি ভালো ছোলার বীজ জলে ভিজিয়ে একদিন রেখে, পরে উপরোক্ত টবে রোপণ করা হ'ল। টবের মাটির ওপর জল ছিটিয়ে দেওয়া হ'ল। কিছুদিন পরে টব-দুটিতে ছোলা-উদ্ভিদ্‌কে বীজ থেকে অঙ্কুরিত হতে দেখা গেল।

এর পরেও টব-দুটিতে জল-সেচন করা হ'ল, ফলে উদ্ভিদ্ আরও বড় হ'ল। এর পরে একটি টবে শুধু জল-সেচন করা হ'ল। দ্বিতীয় টবে জল-সেচন বন্ধ করা হ'ল। তিন থেকে পাঁচ দিন পরে দেখা গেল, দ্বিতীয় টবের ছোলা-উদ্ভিদ্ জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে ও আট দিন পরে দ্বিতীয় টবের গাছটিকে শুকিয়ে মরে যেতে দেখা যাবে। অপর-পক্ষে প্রথম টবের গাছ জল পাওয়ায় বৃদ্ধিলাভ করবে ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে।

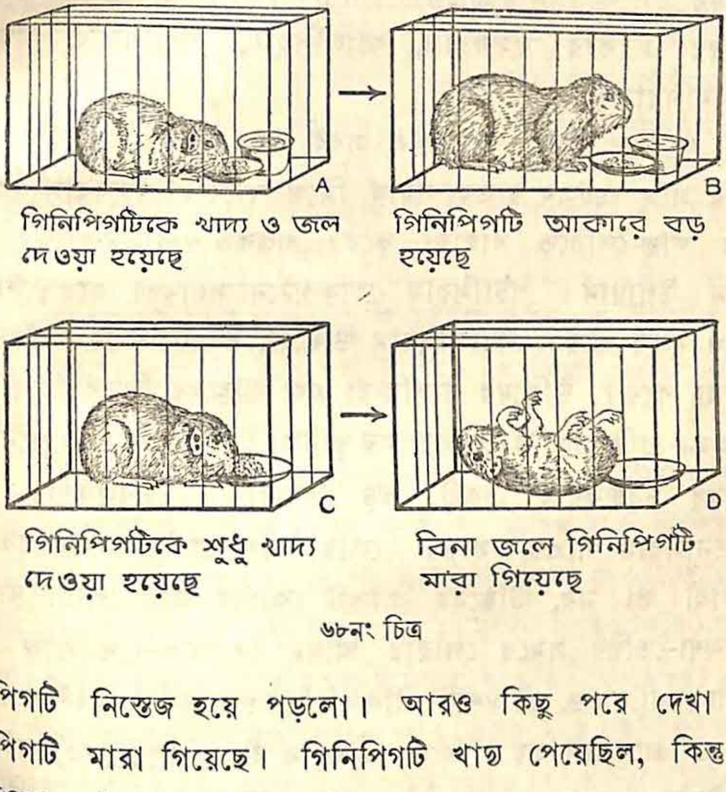


৬৭নং চিত্র—উদ্ভিদের জলের প্রয়োজনীয়তার পরীক্ষার তৃতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় টবের উদ্ভিদ্‌টি জল না পাওয়ায় মৃত।

সিদ্ধান্ত : জলের মাধ্যমে উদ্ভিদ্ মাটি থেকে তার খাদ্য গ্রহণ করে। জল উদ্ভিদ্-কোষের সজীবতা রক্ষা করে। জলের মাধ্যমে উদ্ভিদের দেহের ভেতরকার নানা অঙ্গে খাদ্য-সরবরাহও করা হয়ে থাকে। তাই দ্বিতীয় টবে জল-দেওয়া বন্ধ করার ফলে উদ্ভিদ্ ধীরে ধীরে শুকিয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় ও পরে মরে যায়।

দ্বিতীয় পরীক্ষা : একটি গিনিপিগকে একটি আলাদা খাঁচায় রাখা হ'ল। গিনিপিগটিকে এক সপ্তাহ ধ'রে খাদ্য ও জল ঠিকমতো দেওয়া হ'ল। এর পরে খাঁচার ভেতর থেকে জলের পাত্রটিকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। বিনা জলে কি-ভাবে গিনিপিগ থাকে তা লক্ষ্য করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণঃ এক সপ্তাহ ধ'রে খাদ্য ও জল পেয়ে গিনিপিগটিকে বেশ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে ও আকারে বড় হতে দেখা গেল। জলের পাত্রটি সরিয়ে নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে গিনিপিগটিকে জলের জন্য খাঁচার মধ্যে অস্থির হয়ে উঠতে দেখা গেল। পরে জল না পেয়ে



৬৮নং চিত্র

গিনিপিগটি নিস্তেজ হয়ে পড়লো। আরও কিছু পরে দেখা গেল গিনিপিগটি মারা গিয়েছে। গিনিপিগটি খাদ্য পেয়েছিল, কিন্তু জল না পাওয়ায় বেঁচে থাকতে পারলো না।

সিদ্ধান্তঃ 'জলই জীবের জীবন'—এই পরীক্ষায় এই সত্যটি প্রমাণিত হ'ল।

সজীবের উপর খাদ্যের প্রভাব

কার্বন উদ্ভিদের বিবিধ খাদ্য-তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। মাটির ভেতরে যে-সমস্ত ধাতব লবণ থাকে, তাদের মধ্যে নাইট্রাইট, নাইট্রেট ও অ্যামোনিয়া প্রধান।

নাইট্রোজেন উদ্ভিদের তৈরি-করা প্রোটিন-খাদ্যের একটি উপাদান। নাইট্রোজেনে গাছ শক্ত ও মজবুত হয়। ইউরিয়া আমরা মাঠে-বাগানে ব্যবহার করি। এটিও নাইট্রোজেন-ঘটিত যৌগ। গাছের পাতার মধ্যে যে সবুজকণা থাকে, তার মধ্যেও নাইট্রোজেন থাকে। ফলনশীল উদ্ভিদের পক্ষে নাইট্রোজেন অপরিহার্য। নাইট্রোজেনের পরই উদ্ভিদের দরকার ফস্‌ফরাস, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, গন্ধক ও ম্যাগনেসিয়াম।

পূর্বোক্ত ধাতব পদার্থগুলি সবই জলে দ্রবণীয়। মাটির ভেতরে জলের সঙ্গে এইসব ধাতব পদার্থ মিশে থাকে। ফস্‌ফরাস প্রোটিন-ঘটিত খাদ্য-তৈরিতে সাহায্য করে। গন্ধকও প্রোটিন-খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। পটাসিয়াম কোষ-গঠনে সহায়তা করে; উদ্ভিদ্‌কে পুষ্ট ও সবল করে। ক্যালসিয়াম উদ্ভিদের সর্বপ্রকার বিপাকীয় কাজে সাহায্য করে। উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়া এবং উদ্ভিদের ভিতর দিয়ে জলের ঊর্ধ্বগমন-প্রক্রিয়াতে ক্যালসিয়ামের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ম্যাগনেসিয়াম উদ্ভিদের সবুজকণার একটি বড় উপাদান। সবুজকণায় 56% ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া যায়। লোহা শুধু প্রাণীদের শরীরের পক্ষে উপকারী তা নয়, উদ্ভিদের প্রতিটি কোষের জন্যে লোহা দরকার। সবুজকণা-তৈরির সময়ে লোহার আয়ন উৎসেচক-রূপে কাজ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই দশটি মৌলিক ধাতব পদার্থের কম-বেশী প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। এদের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক ও ফস্‌ফরাস—এই ছয়টি উপাদান অধাতব; আর ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহা—এই চারটি উপাদান ধাতব। উদ্ভিদ্ বাতাস থেকে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন শোষণ ক'রে নিজের দেহের ভেতর টেনে নেয়। গাছের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এইসব উপাদানের প্রয়োজনীয়তা কতখানি তা বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা ক'রে প্রমাণ করেছেন। এই পরীক্ষায়, চারা-গাছ মাটিতে পুঁতে পরীক্ষা করা হয় না। জলে গাছের প্রয়োজনীয় উপাদান মিশিয়ে, সেই জলে চারা-গাছকে রেখে তার পুষ্টি ও বৃদ্ধি কতটা তা লক্ষ্য

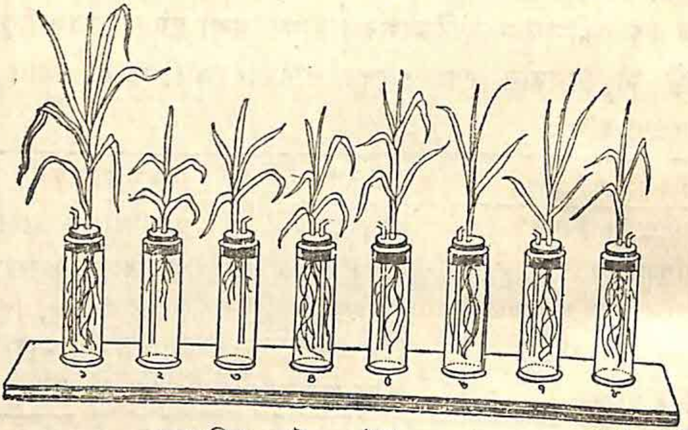
করা হয়। ঠিক অনুপাতে মৌলিক উপাদানগুলিকে জলে মিশিয়ে পরীক্ষার জন্য যে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, তার নাম **কৃষ্টিজল।** সেইজন্য এই পরীক্ষাকে 'কৃষ্টিজলের পরীক্ষা' বলা হয়। আদর্শ কৃষ্টিজলের মধ্যে কী কী উপাদান এবং তাদের পরিমাণ কত, তার একটা তালিকা নিচে দেওয়া হ'ল ঃ

লবণের নাম	পরিমাণ	গাছের প্রয়োজনীয় লবণ
পটাসিয়াম নাইট্রেট	এক গ্রাম	পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন
পটাসিয়াম ফস্‌ফেট	এক গ্রাম	পটাসিয়াম, ফস্‌ফরাস
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	এক গ্রাম	ম্যাগনেসিয়াম, গন্ধক
ক্যালসিয়াম নাইট্রেট	তিন গ্রাম	ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন
ফেরিক ফস্‌ফেট	অতি সামান্য	লোহা, ফস্‌ফরাস

উপরোক্ত পরিমাণে লবণগুলিকে একসঙ্গে ক'রে এক লিটার পাতিত জল বা হাজার সি.সি. পাতিত জল মিশিয়ে যে মিশ্রণ তৈরি করা হয়, সেই মিশ্রণকে **কৃষ্টিজল** বলা হয়।

প্রথম পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ঃ কৃষ্টিজলের পরীক্ষায় প্রথমে চীনা-মাটির পাত্রে কতকগুলি সমান আকারের উদ্ভিদ্-বীজ পাতিত জল দিয়ে অঙ্কুরিত ক'রে রাখা হয়। এরপর আটটি সমান আকারের জার নিয়ে টেবিলে পর পর সাজিয়ে রাখা হয়। জারের মুখের কর্কে একটা ফুটো বা ছিদ্র থাকে এবং তার মধ্যে দিয়ে মূল-সমেত চারা-গাছটিকে দেওয়া ঢুকিয়ে হয়। কর্কে আর-একটা ফুটো থাকে, তার ভেতর দিয়ে একটা কাঁচের নল ভেতরে ঢোকানো থাকে (৬৯নং চিত্রে যেমন আছে)। আটটি জারের মধ্যে জারের গলা পর্যন্ত কৃষ্টিজল ঢেলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় জারে কৃষ্টিজল থেকে প্রথম পটাসিয়াম বাদ দিয়ে, বাকী লবণ-মিশ্রণ ঢেলে দেওয়া হয়। তৃতীয় জারে সেইরকম ক্যালসিয়াম বাদ দিয়ে বাকী লবণ-মিশ্রণ ঢেলে দেওয়া হয়। এইভাবে চতুর্থ জারে ম্যাগনেসিয়াম, পঞ্চম জারে লোহা, ষষ্ঠ জারে ফস্‌ফরাস, সপ্তম জারে গন্ধক এবং অষ্টম জারে নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বাদ দিয়ে, বাকী লবণ-মিশ্রণ ঢেলে দেওয়া হয়। প্রতিটি জারের গলা পর্যন্ত কৃষ্টিজলের সঙ্গে পাতিত জল দেওয়া হয়।

এইভাবে প্রায় দুই সপ্তাহ ধ'রে আটটি জার আলো-হাওয়ার মাঝে টেবিলের উপর রেখে দেওয়া হ'ল। এই সময়ের মধ্যে জারের ভেতরকার



৬৯নং চিত্র—কৃষ্টিজলে উদ্ভিদের পরীক্ষা।

চারা-গাছগুলি বেশ বড় হয়ে উঠতে দেখা যায়। গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা প্রভৃতিও গজাতে দেখা যায়।

সপ্তাহ-দুয়েক উপরোক্তভাবে রাখার পরে দেখা যায়, প্রথম জারের চারা-গাছটি বেশ ভালোভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় জারের চারা-গাছটি লম্বা না হয়ে বেঁটে হয়েছে ও এর পাতার রঙ হালকা সবুজ হয়েছে। তৃতীয় জারের চারা-গাছটির মূলের বৃদ্ধি খুবই কম হয়েছে। গাছের পাতায় দাগ পড়েছে ও পাতাগুলি গুটিয়ে গিয়েছে। চতুর্থ জারের গাছের পাতাগুলি হালকা হলদে হয়ে গিয়েছে। পঞ্চম জারের গাছের পাতার রঙ সবুজের পরিবর্তে বেশ হলদে হয়ে গিয়েছে। ষষ্ঠ জারের গাছটিকে, বৃদ্ধি পাবার পরে, ক্ষয়প্রাপ্ত হতে দেখা যাবে। সপ্তম ও অষ্টম জারের গাছগুলির বৃদ্ধি প্রথম থেকেই ব্যাহত হতে দেখা যাবে। গাছের পাতাগুলিকেও হলদে হয়ে যেতে দেখা যাবে।

সিদ্ধান্ত: এই পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মৌলিক উপাদানগুলি গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সহায়ক। ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম গাছের সাধারণ বৃদ্ধিকে সাহায্য করে এবং মূলের শোষণ-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম পাতায় 'ক্লোরোফিল' বা সবুজকণা

তৈরি করায় সাহায্য করে এবং পাতা দেখতে তাই সবুজ হয়। গন্ধক, ফস্‌ফরাস ও নাইট্রোজেন গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তোলে এবং সতেজ ও মজবুত রাখে।

দ্বিতীয় পরীক্ষা : একটি গিনিপিগকে একটি আলাদা খাঁচায় রাখা হ'ল। গিনিপিগটিকে এক সপ্তাহ ধ'রে খাদ্য ও জল ঠিকমতো দেওয়া হ'ল। এর পরে খাঁচার ভেতর থেকে খাদ্যের পাত্রটিকে সরিয়ে নেওয়া হ'ল। বিনা খাদ্যে গিনিপিগের অবস্থা লক্ষ্য করা হ'ল।

পর্যবেক্ষণ : এক সপ্তাহ ধ'রে খাদ্য ও জল পেয়ে গিনিপিগটিকে



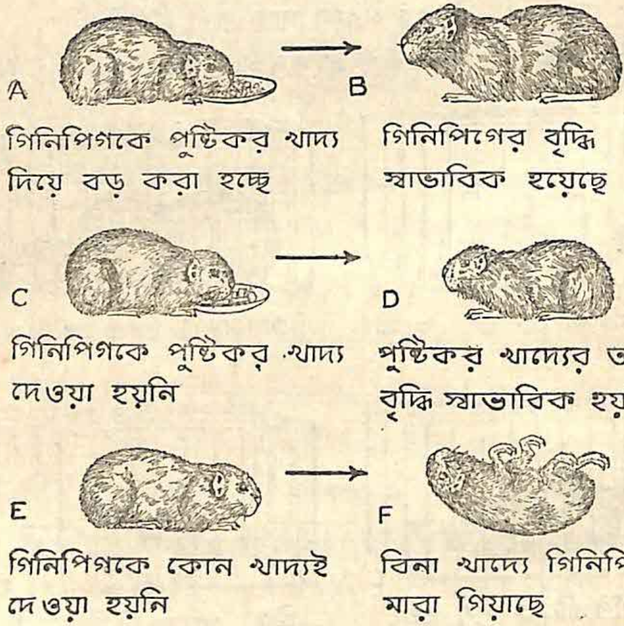
৭০নং চিত্র

বেশ স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে ও আকারে বড় হতে দেখা গেল। খাদ্যের পাত্রটিকে খাঁচার ভেতর থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরে গিনিপিগটি প্রথমে অস্থিরভাবে খাদ্য খুঁজতে লাগলো। অস্থিরতার পরে, খাদ্য না পেয়ে গিনিপিগটিকে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখা গেল। আরও কিছু পরে দেখা গেল গিনিপিগটি মারা গিয়েছে। গিনিপিগটি জল পেয়েছিল, কিন্তু খাদ্য না পাওয়ায় বেঁচে থাকতে পারলো না।

সিদ্ধান্ত : খাদ্য দেহকে স্বাভাবিকভাবে ধ'রে রাখে। খাদ্য

না পেলে সজীবের মৃত্যু হয়। এই পরীক্ষায় শাকসব্‌জির পাতা ছোট ক'রে কেটে, খাদ্যের পাত্রে খাদ্য-হিসাবে রেখে পরীক্ষা করা হয়।

তৃতীয় পরীক্ষাঃ তিনটি খাঁচায় (ACE) তিনটি একই বয়সের গিনিপিগ রাখা হ'ল। প্রথম খাঁচার (A) গিনিপিগটিকে প্রোটিন, শর্করা, স্নেহ ও লবণ-জাতীয় খাদ্য খেতে দেওয়া হ'ল। দ্বিতীয় খাঁচার (C) গিনিপিগটিকে কম ক'রে বা পুষ্টি যাতে কম আছে, সেই ধরনের



৭১নং চিত্র

খাদ্য খেতে দেওয়া হ'ল। তৃতীয় খাঁচার (E) গিনিপিগটিকে কোন খাদ্যই খেতে দেওয়া হ'ল না। এখন গিনিপিগগুলিকে লক্ষ্য কর।

পর্যবেক্ষণঃ প্রথম খাঁচার (A) গিনিপিগটিকে স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখা গেল (B)। দ্বিতীয় খাঁচার (C) গিনিপিগটির বৃদ্ধি প্রথম খাঁচার গিনিপিগটির মতো তেমন হ'ল না (D)। তৃতীয় খাঁচার (E) গিনিপিগটি খাদ্য না পেয়ে মরে গেল (F)।

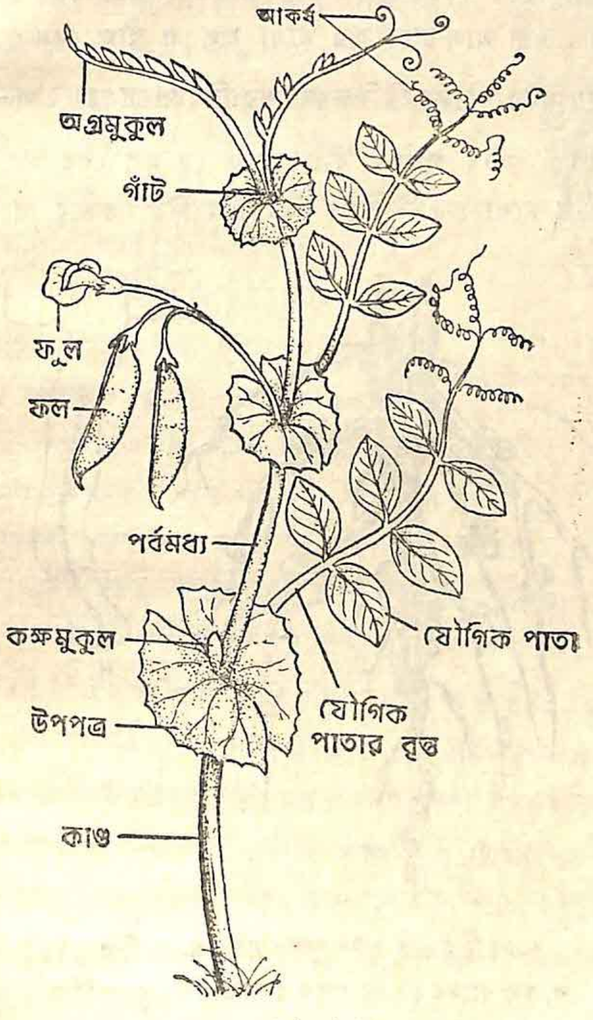
সিদ্ধান্তঃ দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি সজীবের চাই পুষ্টিকর খাদ্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বহিরাকৃতি

মটর উদ্ভিদ্

আমরা জানি সব গাছ ফুল ধারণ করতে পারে না, যেমন—শ্যাওলা, মস্, ফার্ন ইত্যাদি। সেজন্য যে-সব উদ্ভিদে ফুল হয় না,



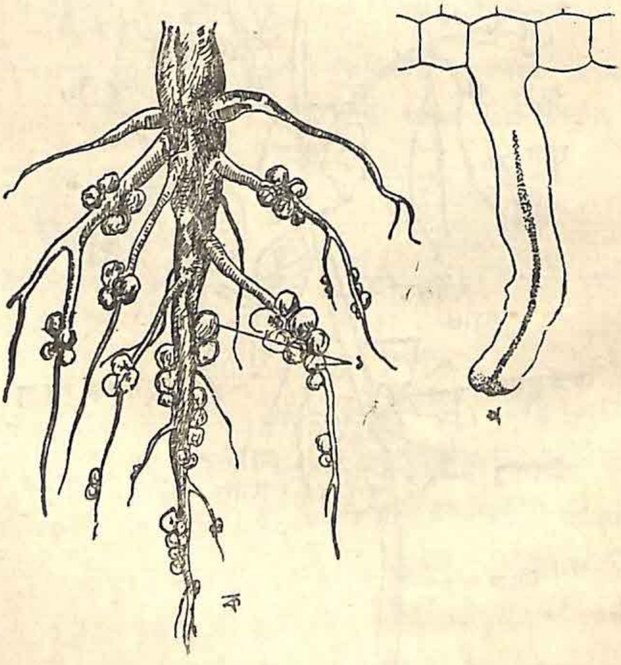
৭২নং চিত্র—একটি সম্পূর্ণ মটর উদ্ভিদের চিত্র।

তাদের আমরা বলি **অপুষ্পক উদ্ভিদ্‌**। আর যে-সব উদ্ভিদে ফুল হয়, তাদের বলি **সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌**। মটর উদ্ভিদে ফুল হয়, তাই মটর সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌।

ফুল ধারণ করা ছাড়াও, সপুষ্পক উদ্ভিদের আরও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে ; যেমন—মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল ও বীজ। মটর উদ্ভিদ্‌ লতানো গাছ। এর কাণ্ড, শাঁস প্রভৃতি সবুজ ও নরম। শুকনো কাঠি পুঁতে, এদের আশ্রয় দিয়ে বড় করতে হয়। গাছ বড় হয়ে গেলে, মাচায় তুলে দিতে হয়। এরা মাস-চারেকের মধ্যে ফল ও বীজ দেয়।

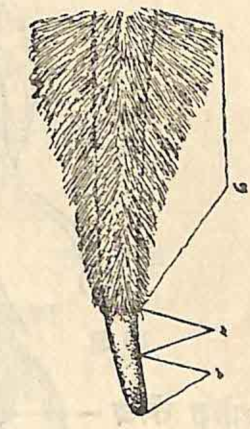
নিচে মটর গাছের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেওয়া হ'ল—

মূল ঃ মটর গাছের বীজ থেকে যে মূল বের হয়, সেই মূলই সোজা মাটির মধ্যে নেমে যায়। মূলটি মাটির ভেতরে প্রবেশ করবার



৭৩নং চিত্র—ক, মটর মূলের নডিউল-এর চিত্র (১) ;
খ, মূলরোমের ভেতর থেকে রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার
বৃদ্ধি দেখানো হচ্ছে।

সময়ে শাখা-প্রশাখায় গোল-গোল, ছোট-ছোট গুটি দেখা যায়। এই গুটিগুলিকে **নডিউল** বলা হয়। এর মধ্যে সজীব ব্যাক্‌টিরিয়া বাস করে। এদের নাম **নাইট্রোজেন-স্থিতিস্থাপক ব্যাক্‌টিরিয়া** (Nitrogen-fixing bacteria)। এরা বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্যাস শোষণ ক'রে, মাটির ভেতরকার নানারকমের ধাতব লবণের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রেট তৈরি করে। এই নাইট্রেট মটর গাছ খাদ্য-হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যাক্‌টিরিয়া নিজেদের খাদ্য মটর গাছ থেকে যোগাড় করে। পরস্পরকে খাদ্যে সাহায্য ক'রে একটি সজীবের মধ্যে আর-একটি সজীবের ঘর-সংসার করা চলতে থাকে। এইরকম চমৎকার ব্যবস্থাকে **মিথোজীবিতা** (Symbiosis) বলা হয়। মূলে চারটি অঞ্চল দেখা যায়। মূলের শেষে একটি টুপির মতো ঢাকনা থাকে। একে **মূলত্রাণ** বলে ও এই অঞ্চলকে **মূলত্রাণ অঞ্চল** বলা হয়। এর পেছনের অঞ্চলকে **বর্ধনশীল অঞ্চল** বলে। বর্ধনশীল অঞ্চল সবসময় বাড়তে থাকে। বর্ধনশীল অঞ্চলের পেছনের অঞ্চলকে **মূলরোম অঞ্চল** বলা হয়। এই অঞ্চল থেকে মূলরোম বের হয়। মূলরোম অঞ্চলের পেছনের অঞ্চলটিকে মূলের **স্থায়ী অঞ্চল** বলা হয়। এই অঞ্চল থেকে মূলরোম বের হয় না।

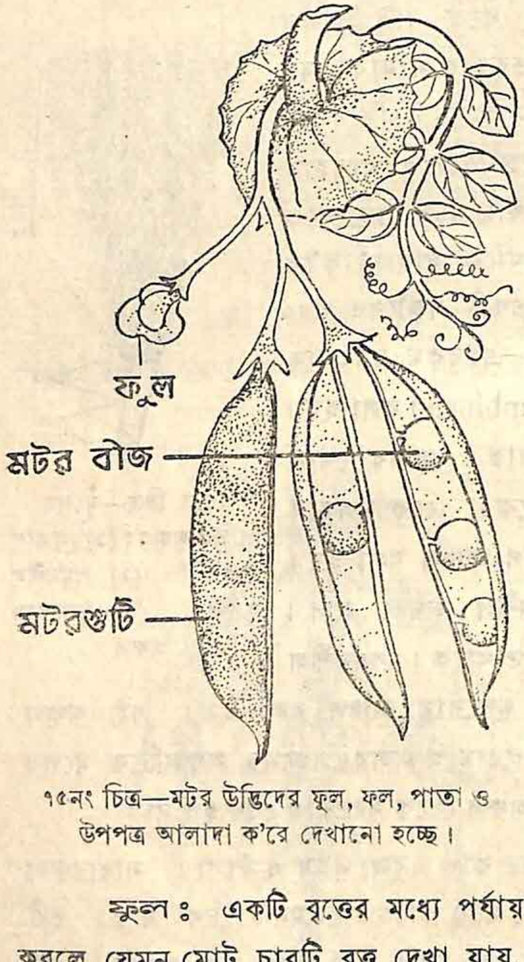


৭৪নং চিত্র—মূলের বিভিন্ন অঞ্চল: (১) মূলত্রাণ অঞ্চল; (২) বর্ধনশীল অঞ্চল; (৩) মূলরোম অঞ্চল।

কাণ্ড: মটর উদ্ভিদের কাণ্ড সবুজ, নরম ও ফাঁপা। সাধারণতঃ যেমন কাণ্ডে গাঁট বা **পর্ব** থাকে, মটর কাণ্ডেও তেমনটি দেখা যায়। দুটি গাঁটের মাঝের কাণ্ডকে **পর্বমধ্য** বলা হয়। পর্ব ফাঁপা নয়, ভরাট। পর্ব থেকেই শাখা-প্রশাখা বের হয়। কাণ্ড ও শাখার সংযোগের জায়গাতে দুটি বড় পাতা বেরিয়ে পর্বকে ঢেকে রাখে। বড় পাতা-দুটিকে **উপপত্র** বলা হয়। উপপত্র-দুটি চওড়া পাতার মতো ব'লে এদের আবার **ফলকাকার উপপত্র** বলা হয়।

পাতা: কাণ্ড বা শাখা-প্রশাখার পর্ব থেকে পাতা বের হয়।

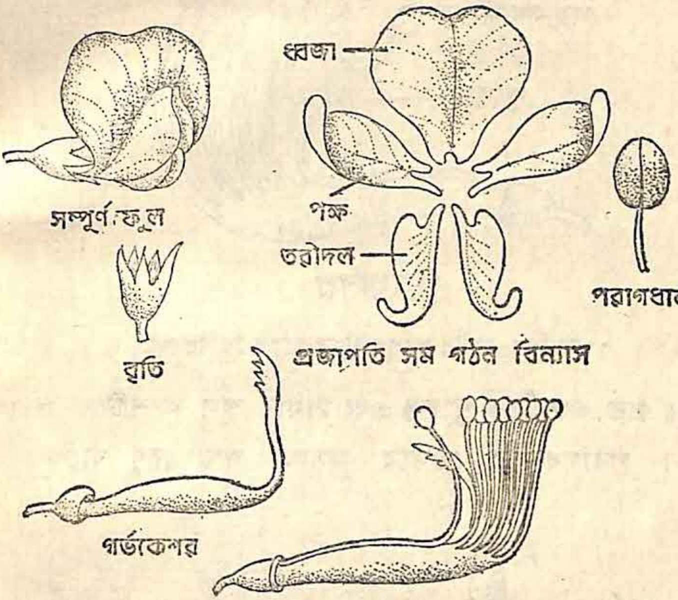
মটর উদ্ভিদের পাতা সরল নয়। পাতাগুলি যৌগিক। একটি বড় পাতার মধ্যশিরা মটর পাতার বোঁটায় পরিণত হয়, আর বড় পাতাটি নয়টি বা এগারোটি ছোট-ছোট ফলকে পরিণত হয়। গোড়ার ফলকগুলিতে দুটি ক'রে জোড়া থাকে। প্রায় তিন-জোড়া বা চার-জোড়া ফলক মটর পাতায় দেখা যায়। এই ধরনের ফলককে অণুফলক বা পত্রক বলা হয়। পাতার শেষের অণুফলক-তিনটি বা পাঁচটি সরু সুতোয় পরিণত হয়। এরা পোঁতা কাঠিগুলিকে স্প্রিং-এর মতো জড়িয়ে ধরে। এতে গাছের উপরে উঠতে সুবিধে হয়। সরু, সবুজ ও জড়িয়ে-ধরা সুতোর মতো অঙ্গগুলিকে মটর গাছের আকর্ষ বলে।



৭৫নং চিত্র—মটর উদ্ভিদের ফুল, ফল, পাতা ও উপপত্র আলাদা ক'রে দেখানো হচ্ছে।

ফুলঃ একটি বৃত্তের মধ্যে পর্যায়ক্রমে আরও তিনটি বৃত্ত অঙ্কন করলে, যেমন মোট চারটি বৃত্ত দেখা যায়, তেমনি মটর গাছের ফুলের মধ্যে একটির ভেতর একটি ক'রে ফুলের অংশ বা স্তবক দেখা যায়। চারটি স্তবকের মধ্যে সবচেয়ে বাইরে যেটি থাকে, তাকে বলে বৃতি। বৃতিই ফুলের প্রথম স্তবক। মটর ফুলে পাঁচটি বৃত্যংশ জুড়ে একটি চোঙের মতো বৃতি পাপড়ির গোড়ায় দেখা যায়। মটর ফুলে পাঁচটি অসমান পাপড়ি দেখা যায়। পাপড়িগুলিকে একত্রে বা এক কথায়

দলমণ্ডল বলা হয়। মটর ফুলের পাপড়িগুলি এমনভাবে সাজানো থাকে যে, হঠাৎ দেখলে, প্রজাপতির মতো মনে হয়। তাই মটর ফুলের পাপড়িগুলিকে প্রজাপতি-সম পাপড়ি বলা হয়ে থাকে। পাঁচটি পাপড়ির

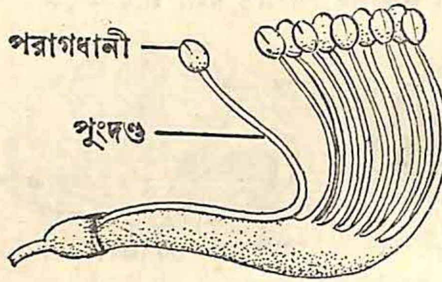


১৬নং চিত্র—মটর ফুলের বিবিধ স্তবক দেখানো হচ্ছে।

মধ্যে সবচেয়ে বড় পাপড়িটিকে চামচের মুখের মতো দেখতে। এটিকে বলা হয় ধ্বজা। ধ্বজার মধ্যে দুটি পাপড়ি ডানার মতো দু'পাশে থাকে। ডানার মতো থাকে ব'লে এদেরকে পক্ষ বলা হয়। পক্ষের ভেতরে আবার দুটি পাপড়ি পাশাপাশি সামনের দিকে কিছুটা বের হয়ে থাকে। এ-দুটি পাশাপাশি থাকার জন্যে কতকটা নৌকার (তরীর) মতো দেখায় ব'লে, এদের বলা হয় তরীদল। তাহলে মটর ফুলের দলমণ্ডলে পাঁচটি পাপড়ি থাকে—প্রথমটি ধ্বজা, তারপরের দুটিকে পক্ষ ও শেষ-দুটিকে তরীদল বলা হয়।

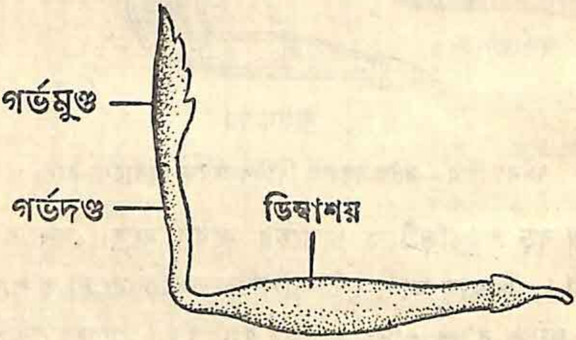
দলমণ্ডলের ভেতরকার ফুলের তৃতীয় স্তবককে পুং-স্তবক বলা হয়। পুং-স্তবকে দশটি পুংকেশর থাকে। মটর ফুলে নয়টি পুংকেশর পরস্পর

জুড়ে একটি গুচ্ছে পরিণত হয়। শুধু একটি মাত্র পুংকেশর আলাদা থাকে। প্রতিটি পুংকেশরের সরু ও লম্বা বোঁটার উপর একটি স্থূল অংশ থাকে।



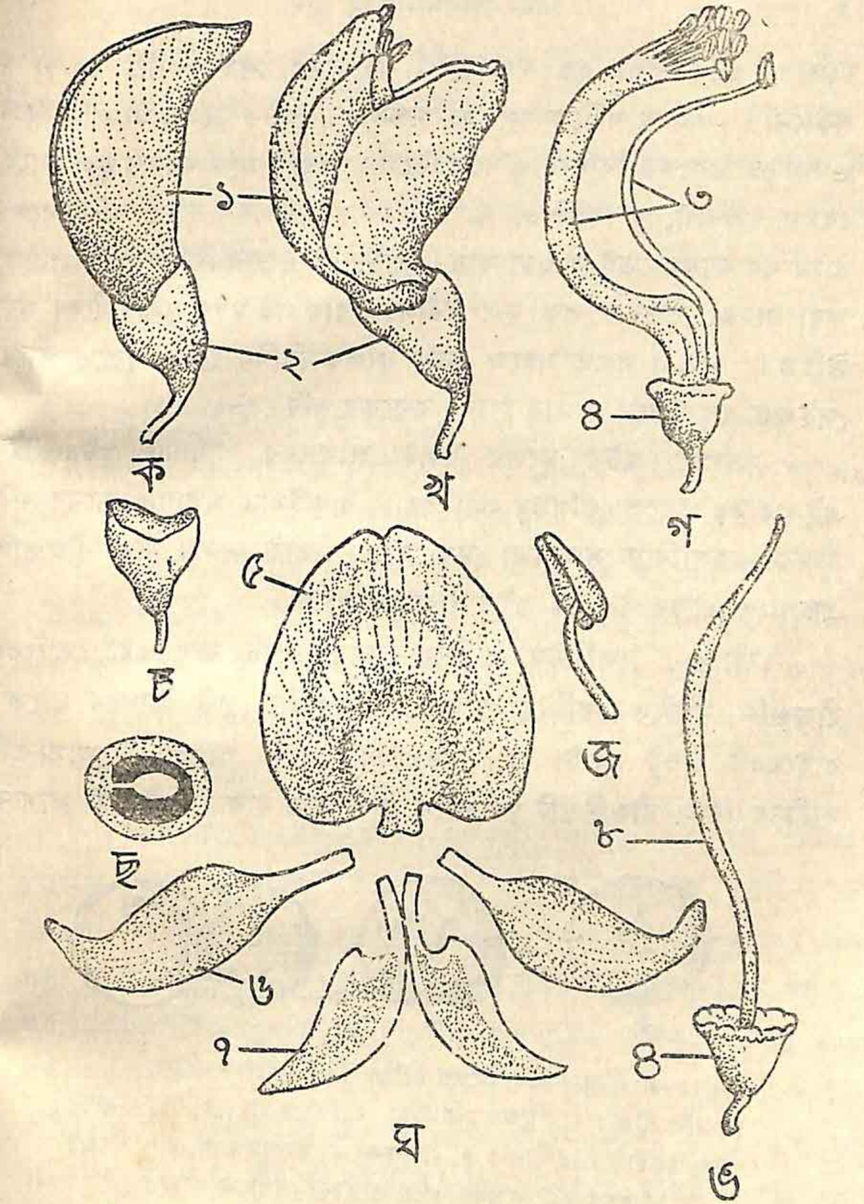
৭৭নং চিত্র—মটর ফুলের পুংকেশরের বিবিধ অংশ।

পুংকেশরের সরু অংশটিকে **পুংদণ্ড** এবং মাথার স্থূল অংশটিকে **পরাগধানী** বলা হয়। পরাগধানীর ভেতরে অসংখ্য সূক্ষ্ম রেণু থাকে। নয়টি



৭৮নং চিত্র—মটর ফুলের গর্ভপত্রের বিবিধ অংশ।

পুংকেশর মিলে একটি লম্বা গুচ্ছ তৈরি হয়। এর ফলে এই গুচ্ছের ভেতরের দিকে একটা লম্বা চাপা গর্ত থাকে। সেই গর্তের মধ্যে **স্ত্রী-স্তবকের** একটি মাত্র গর্ভপত্র থাকে। স্ত্রী-স্তবক ফুলের চতুর্থ বা শেষ স্তবক। গর্ভপত্রটি দেখতে লম্বা কুঁজোর মতো। এর গোড়ার দিকটি স্থূল। এই অংশকে **ডিম্বাশয়** বলা হয়। এর পরের অংশ সরু নলের



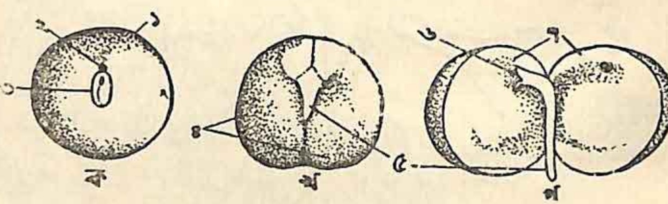
৭৯নং চিত্র—বক ফুলের বিবিধ অংশ।

ক, সম্পূর্ণ বক ফুল ; খ, বক ফুলের বিভিন্ন দলমণ্ডল ; গ, পুং-স্তবক ও স্ত্রী-স্তবক ; ঘ, প্রজাপতিসম দলমণ্ডল ; ঙ, গর্ভকেশর ; চ, যুক্ত বৃতি ; ছ, গর্ভাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ ; জ, পুংকেশর-সহ পরাগধানী। ১, দলমণ্ডল ; ২, বৃতি ; ৩, পুং-স্তবক ; ৪, পুষ্পাক্ষ ; ৫, ধ্বজা ; ৬, পক্ষ ; ৭, তরীদল ; ৮, গর্ভকেশর।

মতো। একে বলা হয় **গর্ভদণ্ড**। গর্ভপত্রের শেষ অংশটি চওড়া ও ছড়ানো। এই অংশটিকে বলা হয় **গর্ভমুণ্ড**। মটর ফুলের মতো আকার ও বিভিন্ন স্তবকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে-যাওয়া আরও অনেক ফুল আছে, যেমন—অতসী, অপরাজিতা ও বক। বক ফুল বেশ বড়; পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। তাই, এই ফুলের বিবিধ অংশ পরীক্ষা করা সহজ, সুতরাং বক ফুল পরীক্ষা করার পর মটর ফুল পরীক্ষা করা উচিত। ছাত্ররা যাতে সহজে মটর ফুলের বিবিধ স্তবক বুঝতে পারে, সেইজন্য বক ফুলের ও তার বিবিধ স্তবকের ছবি দেওয়া হ'ল।

ফলঃ মটর ফুলের ফলই আমাদের পরিচিত **মটরশুঁটি**। এই ধরনের ফলকে **লেগিউম** বলা হয়। একটিমাত্র গর্ভপত্রে অনেকগুলি ডিম্বক একসারিতে সাজানো দেখা যায়। তাই ফলের মধ্যে বীজগুলি একপাশে একের পর এক ক'রে সাজানো থাকে।

বীজঃ লেগিউম শুকিয়ে গেলে ফেটে যায় এবং ভেতরের বীজগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে। বীজগুলির দুটি আবরণ থাকে। বাইরেরটি একটু মোটা আর ভেতরেরটি বেশ পাতলা। খোসা-দুটি ছাড়িয়ে দিলে বীজটি দুটি স্থূলভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দুটি ভাগকে



৮০নং চিত্র—মটর বীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।
ক, মটর বীজ ঃ ১, বীজের বহিঃত্বক্; ২, ডিম্বক-রন্ধ্র; ৩, ডিম্বক-নাভী।
খ, ত্বকহীন মটর বীজ ঃ ৪, বীজপত্র; ৫, ভ্রূণমূল। গ, মটর বীজের বীজপত্র-দুটিকে পৃথক্ ক'রে তার ভ্রূণ দেখানো হচ্ছে ঃ
৬, ভ্রূণমুকুল; ৭, বীজপত্র।

বীজের **বীজপত্র** বলা হয়। দুটি বীজপত্রের উপরের দিকে একটি বাঁকা দণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। এই দণ্ডের দু'পাশে একটি ক'রে বীজপত্র আটকে থাকে। এই দণ্ডটিকে **ভ্রূণাক্ষ** বলা হয়। বীজপত্র ও ভ্রূণাক্ষকে

একত্রে মিলিয়ে বীজের ভ্রূণ বলে। মটর বীজের দুটি বীজপত্র থাকায়, মটর উদ্ভিদ্‌কে আমরা দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ্ বলি।

মটর এক ঋতুর গাছ। শীতকালে এর ফলন হয়। উত্তর ভারতে এর চাষ বেশি। ইউরিয়া, পটাস ও ফস্‌ফরাস এর প্রধান সার। মটরে আমরা উদ্ভিদ্-প্রোটিন পেয়ে থাকি।

মাছ

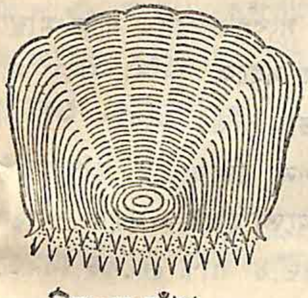
নদী, পুকুর বা দীঘির মাছ, যেমন—রুই, কাতলা, মিরগেল, বাটা, ট্যাংরা প্রভৃতি আমরা সাধারণতঃ বাজারে দেখতে পাই। খাল-বিলের মাগুর, কই এবং শিঙ্গি মাছও আমাদের প্রিয়। সামুদ্রিক মাছ, যেমন—পারশে, পম্‌প্লেট ইত্যাদি সমুদ্রের মাছও আমাদের বাজারে বিক্রি হয়। এক ধরনের মাছের সঙ্গে অন্য ধরনের মাছের বহিরাকৃতি এক হয় না। কিন্তু কোন একটি মাছকে আদর্শ হিসাবে যদি বর্ণনা করা যায়, তাহলে অন্য মাছগুলিকে সহজেই চেনা যায়। বাংলাদেশের আদর্শ মাছ হিসেবে রুই মাছ সুবিদিত।

রুই মাছ ঃ রুই মাছ মেরুদণ্ডী প্রাণী। এর দেহ নৌকার খোলের মতো। দেহের দু'ধার মসৃণ। সমস্ত মাছটিকে তিনটি অঞ্চলে চিহ্নিত করা যায়। মাথা থেকে কানকুয়া পর্যন্ত অঞ্চলকে মাছের মাথা বলা হয়। কানকুয়ার পর থেকে পায়ুছিদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে মাছের ধড় বলা হয়। পায়ুছিদ্রের পর থেকে লেজের শেষ পর্যন্ত অঞ্চলকে লেজ অঞ্চল বলা হয়। রুই মাছের মাথা বাদে দেহের সর্বত্র গোল-গোল আঁশ দিয়ে ঢাকা থাকে। আঁশগুলি ছাদের টালির মতো একের উপর এক ক'রে সাজানো থাকে। রুই মাছের মাথা তিনকোণা ও মুখের ছিদ্রটি মাথার তলার দিকে দেখা যায়। মুখের উপর-চোয়াল ও নিচের চোয়ালের কোণে ছোট শুঁড় বা বারবেল থাকে। মাথার উপরে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে গোলাকার চোখ থাকে। চোখ দিয়ে মাছ দেখতে পায়। মাছের মাথার দু'পাশে একটি ক'রে কানকুয়া থাকে। কানকুয়ার ভেতরের

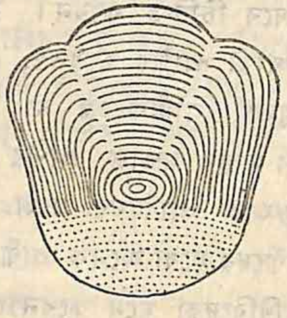
গর্তে লাল টকটকে ফুলকা সাজানো অবস্থায় দেখা যায়। এই ফুলকা দিয়েই মাছ শ্বাসকার্য চালায়। মাছ জলজ প্রাণী। তাই জলে-দ্রবীভূত অক্সিজেন ফুলকার সাহায্যে শোষণ করে এবং দেহের ভেতরে তৈরি-হওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড আবার ফুলকার মাধ্যমেই জলের সঙ্গে মিশে যায়। মাছের দু'পাশে কানকুয়া থেকে লেজের মাঝখান পর্যন্ত একটি চকচকে রেখা দেখা যায়। এই লম্বা রেখাকে মাছের স্পর্শেন্দ্রিয় রেখা (lateral line of sense-organs) বলা হয়। কারণ, এই রেখার উপর মাছের স্পর্শগ্রন্থি থাকে। স্পর্শগ্রন্থি দিয়ে মাছ জলের তাপ, শৈত্য ইত্যাদি অনুভব করতে পারে।

রুই মাছের দেহে পাঁচ রকমের পাখনা থাকে (১৬নং চিত্র দেখ)। এর মধ্যে দু'রকমের পাখনা একজোড়া ক'রে, বাকি তিনটি পাখনা বেজোড়। পাখনাগুলিকে সোজা ক'রে রাখে কতকগুলি কাঠির মতো নরম হাড়। এই হাড়গুলিকে ফিন্-রে বলা হয়। রুই মাছের কানকুয়ার পেছনে একজোড়া পাখনা থাকে। এদের বলা হয় বক্ষ-পাখনা। বক্ষ-পাখনা দিয়ে মাছ সাঁতার কাটে। পেটের মাঝামাঝি জায়গায় আর-একজোড়া পাখনা থাকে। এদের বলা হয় শ্রোণী-পাখনা। শ্রোণী-পাখনাও সাঁতারে সাহায্য করে এবং পায়ুছিদ্রকে ঢেকে রাখে। শ্রোণী-পাখনার পরে আর-একটি পাখনা রুই মাছে থাকে, তাকে বলে পায়ু-পাখনা। শ্রোণী-পাখনা ও পায়ু-পাখনার মাঝামাঝি জায়গাতে পায়ুছিদ্র থাকে। পায়ু থেকে মাছের মল, মূত্র ও ডিম বের হয়। লেজ-পাখনাটি বেশ বড়। এটিই মাছের সবচেয়ে বড় পাখনা। লেজ-পাখনা উপর-নিচ দুই সমান ভাগে ভাগ করা থাকে। প্রত্যেক ভাগের শেষের দিকটি সরু। লেজ-পাখনা দিয়ে মাছ জলের মধ্যে সোজাভাবে থাকতে পারে এবং নৌকার হালের মতো লেজ-পাখনার সাহায্যে মাছ এপাশ-ওপাশ করতে পারে। রুই মাছের পিঠের উপর খাড়াভাবে আর-একটি পাখনা থাকে। একে বলা হয় মাছের পৃষ্ঠ-পাখনা। পৃষ্ঠ-পাখনা দিয়ে মাছ জলের মধ্যে ভারসাম্যতা রক্ষা করে। মাছের গায়ের আঁশগুলি দেখতে গোল—এদের সাইক্লয়েড (cycloid) বলা হয়। মাছের আঁশগুলি সজীব। এর ওপর

পাতলা চামড়ার প্রথম স্তর বা 'এপিডারমাল' স্তর থাকে। এরা দ্বিতীয় স্তর বা 'ডারমিস্' থেকে তৈরি হয়।



টিনয়েড আঁশ



সাইক্লয়েড আঁশ

৮১নং চিত্র

নানারকমের মাছ বিভিন্নপ্রকার জলের মধ্যে বাস করে। সমুদ্রের মাছে ফস্‌ফরাস বেশি থাকে। নদী ও পুকুরের মাছ খেতে মিষ্টি। এদের বলে মিষ্টিজলের মাছ। ডোবা বা পাঁক-ভরা পচা পুকুরে কই, মাগুর, শিঙ্গি, ল্যাটা ইত্যাদি মাছ স্বাভাবিকভাবে থাকতে পারে। কিন্তু রুই, কাতলা, বাটা ইত্যাদি মাছ কেবল পরিষ্কার জলে থাকতে পারে। কই মাছের আঁশে কাঁটা থাকে। এই ধরনের আঁশকে **টিনয়েড** (ctenoid) বলা হয়। অনেক মাছে আঁশ নেই, যেমন—মাগুর ও শিঙ্গি। ইলিশ সামুদ্রিক মাছ। এর আদি নিবাস ছিল নদীর মিষ্টিজলে। তাই ডিম-পাড়ার সময়ে এরা সেই সমুদ্র থেকে বহু দূর পর্যন্ত সাঁতার কেটে নদীর ভেতরে আসে, তারপর নদীর ধারে-ধারে ডিম পেড়ে আবার সমুদ্রে ফিরে যায়। রুই বাদে অন্য মাছে—যেমন ভেটকি মাছে পৃষ্ঠ-পাখনা দুই ভাগে বিভক্ত দেখা যায়। শিঙ্গি মাছেরও পৃষ্ঠ-পাখনা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কেবলমাত্র শক্ত কাঁটা সাজানো থাকে ও দ্বিতীয় ভাগে থাকে নরম ফিন্‌-রে দিয়ে তৈরি স্বাভাবিক পাখনা। মাগুর মাছের পৃষ্ঠ-পাখনা সরু ও ক্ষয়প্রাপ্ত। তাই পৃষ্ঠ-পাখনা দেখেই কোন্‌টা শিঙ্গি আর কোন্‌টা মাগুর তা চিহ্নিত করা যায়। কই মাছের মাথার সব জায়গাতে কাঁটা-ভরা আঁশ আর কাঁটা-ভরা লম্বালম্বি-ভাবে পৃষ্ঠ-পাখনা—কই মাছকে চিহ্নিত ক'রে দেয়।

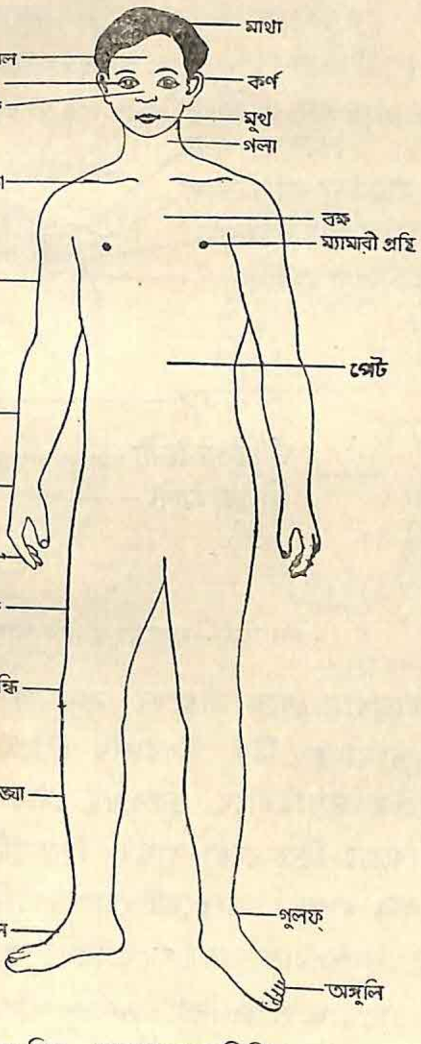
মানবদেহ

জীবন-বিজ্ঞানীরা মানুষকে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে চিহ্নিত করেন। মানুষ স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী। যে-কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র, পৌষ্টিক-তন্ত্র বা সংবহন-তন্ত্রের সঙ্গে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র, পৌষ্টিক-তন্ত্র বা সংবহন-তন্ত্র খুব সহজে তুলনা করা যায়। তবে মানুষ অন্যান্য প্রাণীর মতো হলেও তার বুদ্ধির বিকাশ ও সভ্যতা মানুষকে প্রাণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন দিয়েছে। দু'পায়ে-হাঁটা প্রাণীদের মধ্যে অনেক প্রাণী প্রায় মানুষের মতো হাঁটে—যেমন গোরিলা। প্রাণিবিদেরা মনে করেন যে, গোরিলা-জাতীয় প্রাণী থেকেই বিবর্তনের ফলে আজকের মানবজাতির আবির্ভাব। গোরিলাকে প্রাইমেট-বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই স্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাইমেট-বর্গের মধ্যে মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

বাঁদর বা গোরিলার বহিরাকৃতি ও অন্তর্গঠন থেকে মানুষের বহিরাকৃতি ও অন্তর্গঠনের অনেক প্রভেদ আছে এবং সেইজন্যই মানুষ অন্য প্রাণীদের উপর প্রভুত্ব করতে পারে। যেমন—নিজের পায়ের ওপর ভর দিয়ে মানুষ সোজা দাঁড়াতে পারে, আর সোজা হাঁটতে পারে। এমনকি দৌড়তেও পারে। মানুষের পায়ের গঠন হাতের চেয়েও অনেক মজবুত। মানুষ সব দিকেই পা ঘোরাতে পারে। হাতের চেয়ে পা অনেক লম্বা ও শক্ত। মানুষের মেরুদণ্ডের সঙ্গে তার মাথার করোটি সোজাসুজিভাবে যুক্ত। এর ফলে মানুষ সোজাভাবে সামনা-সামনি বস্তু দেখতে পারে। পা এবং হাতের পাতা ও আঙুল সোজা এবং আঙুলের সন্ধি বা গাঁটগুলি অতি সহজে চালনা করা যায়।

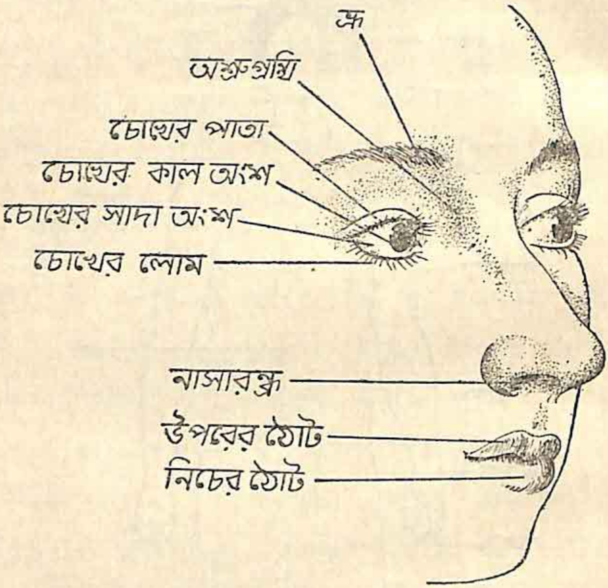
বহু দেশে বহু রকমের মানুষ দেখা যায়। কোন দেশের মানুষ বেঁটে, আবার কোন দেশের মানুষ লম্বা। কোন জাতের মানুষের নাক চ্যাপ্টা, আবার অন্য জাতের মানুষের নাক তীক্ষ্ণ। কিন্তু সাধারণভাবে প্রত্যেক মানুষের দেহের বহিরাকৃতি প্রায় এক। মানুষের মাথা মেরুদণ্ডের উপর সোজাভাবে যুক্ত থাকায়, মাথা একটি প্রণালীতে ঘোরাতে পারা যায়। মানুষের মাথার উপরে প্রচুর চুল থাকে। জলবায়ু অনুসারে

কোন কোন জায়গার মানুষের মাথার চুল লাল বা সোনালী হয়। দুটি চোখের উপরের অংশকে কপাল বলা হয়। কপালের দুই পাশে একটি ক'রে বহিঃকর্ণ দেখা যায়। প্রধানতঃ কানের গর্তকে রক্ষা করা বহিঃকর্ণের কাজ। শব্দতরঙ্গকে ঠিকপথে পরিচালনা করতে বহিঃকর্ণের সহযোগিতা দরকার। বহিঃকর্ণের মূলে ছোট-ছোট রোম থাকে। এই রোমগুলি ধুলো বা ধোঁয়া কানের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না।



৮২নং চিত্র—মানবদেহের বিবিধ অংশ।

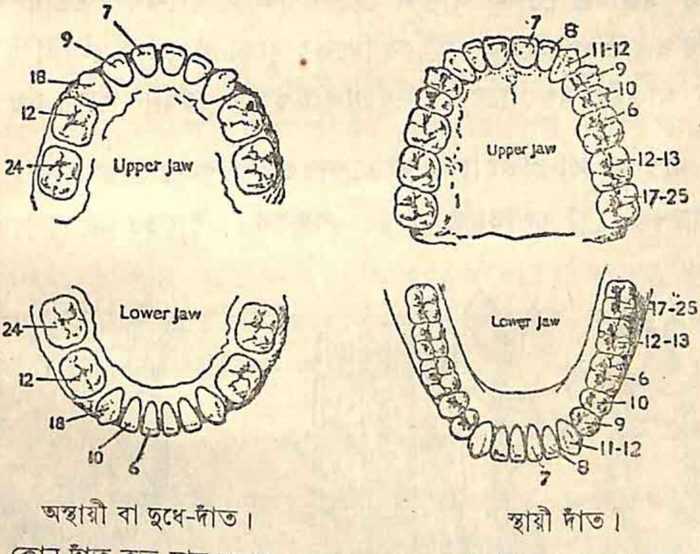
মানুষের চোখ-দুটি কপালের নিচে দুই পাশে একটি ক'রে একই সারিতে দেখা যায়। মানুষের চোখ সরল ও বেশ বড়। চোখের উপর ভ্রূ থাকে। ভ্রূ চোখের গর্তের উপরকার হাড়ের উপর থাকে। মোটা ক'রে ঘন কালো রোম ভ্রূ-র বৈশিষ্ট্য। চোখের উপরকার পাতা ও নিচেকার পাতার মুক্ত-ধারে একসারি ক'রে রোম থাকে। মানুষের চোখের পেছনে আটজোড়া পেশী যুক্ত থাকায় মানুষ চোখ সহজেই ঘোরাতে পারে। দুই



৮৩নং চিত্র—মানুষের মাথার অংশ।

চোখের ঠিক মাঝখান থেকে মানুষের নাক আরম্ভ হয়েছে। নাকের দুটি ছিদ্র বা নাসারন্ধ্র ঠিক উপরকার ঠোঁটের উপরে দেখা যায়। উপরকার ঠোঁটের উপরিভাগে পুরুষদের গোঁফ দেখা যায়। গোঁফের উপর দুটি নাসারন্ধ্রের ছিদ্র দেখা যায়। ছিদ্র-দুটির মাঝে 'কার্টিলেজের সেপ্‌টাম' বা পর্দা থাকে। মানুষের চোখ গোরিলা বা অন্য প্রাণীদের মতো কোটরের ভেতর থাকে না। কোটরের বাইরে বের হয়ে থাকে। এর ফলে মানুষ চারপাশ ভালো ক'রে দেখতে পারে। নাক গোরিলাদের মতো চ্যাপ্‌টা নয়, বেশ উঁচু এবং নাকের আগা নিটোল হয় বা ছুঁচালো

হয়। চোখ এবং নাকের গঠন ও স্থিতি মানুষের বহিরাকৃতির বৈশিষ্ট্য। শিম্পাঞ্জি বা গোরিলার চোয়াল উঁচু ও সামনের দিকে বেড়ে একটা ত্রিভুজের আকার নেয়। মানুষের কিন্তু মোটেই তা নয়; চোয়াল-ছুটি ছোট। বাঁদরের নাক চ্যাপ্‌টা ও নাকের ছিদ্র প্রায় দেখা যায় না। সে-তুলনায় মানুষের নাক অনেক উঁচু। মানুষের দাঁতও অন্যান্য 'প্রাইমেট' প্রাণীদের চেয়েও অনেক স্বতন্ত্র। সামনের ইন্‌সিসার ও পাশের 'কুকুরে-দাঁত' বা ক্যানাইন প্রায় একই আকারের হয়। মোটা ও বেঁটে চারটি প্রিমোলার ও ছয়টি মোলার চোয়ালের শেষের দিকে থাকে। দাঁতের সিরিজ প্রায় সমান দেখতে হয় ব'লে ঠোঁটে সেগুলি ঢাকা থাকে।



অস্থায়ী বা দুধে-দাঁত। কোন্ দাঁত কত মাস বয়সে ওঠে, তা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

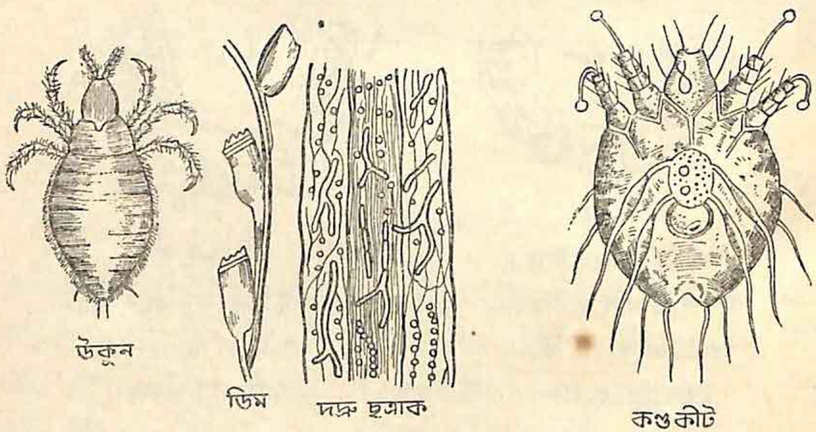
স্থায়ী দাঁত। কোন্ দাঁত কত বছর বয়সে ওঠে, তা সংখ্যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

৮৪নং চিত্র

মানুষের গলার পরের অংশ বুক। বুকের দু'ধারে স্তন থাকে। অনেক পুরুষের বুকে চুল দেখা যায়। বুকের পর পেট। পেট নাভির দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত—উপরকার পেট ও তলাকার পেট। পেটের পরেই জনন-অঙ্গ থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, মানুষের পা-দুটি হাতের চেয়ে অনেক মজবুত। হাতের প্রথম অংশকে **পুরোবাহু** (arm) বলা হয়। এটি বেশ মজবুত। পুরোবাহুর ভেতরের পেশীকে **বাইসেপ্‌স** (biceps) বলা হয়। আবার পুরোবাহুর বাইরের দিকের পেশীকে বলা হয় **ট্রাইসেপ্‌স** (triceps)। হাতের দ্বিতীয় অংশকে **বাহু** বলা হয়। বাহুর মধ্যে দুটি হাড় থাকে। হাত উরশ্চক্রে 'বল-সকেট' সন্ধিতে আটকে থাকে। তাই মানুষ তার হাত অত সহজে চারপাশে ঘোরাতে পারে। হাতের তৃতীয় অংশ হচ্ছে **মণিবন্ধ** এবং শেষ অঞ্চল হচ্ছে **করতল**। করতলে পাঁচটি আঙুল থাকে। প্রতিটি আঙুলই অসমান। সবচেয়ে সরু ও ছোট আঙুল দেহের দিকে থাকে। তৃতীয় আঙুল সবচেয়ে বড় এবং দেহের বাইরের দিকের বুড়ো-আঙুলটি মোটা ও বেঁটে। প্রতিটি আঙুলে নখ থাকে। নখগুলি চওড়া ও কখনও বাঁকা হয় না।

মানুষের পা-দুটি হাতের মতো চারভাগে বিভক্ত; যথা—(1) **জঙ্ঘা,** (2) **জানুতল,** (3) **গোড়ালি,** ও (4) **পদতল**। হাতের মতো পদতলেও



৮৫নং চিত্র

পাঁচটি আঙুল থাকে। পদতল, করতলের চেয়ে বড়। গোড়ালি ও পদতল সমান্তরাল থাকায় মানুষ তাড়াতাড়ি হাঁটতে বা দৌড়তে পারে। পায়ের পেশীগুলিকে কাফ্‌পেশী বলা হয়।

সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মতো মানুষের দেহের সর্বাঙ্গে লোম থাকে। হাতের গোড়ায় ও কুঁচকিতে লোম বড়-বড় হয়। পা শ্রোণী-চক্রের সঙ্গে এমনভাবে আটকানো থাকে যে, মানুষ সহজেই তা নানা দিকে সঞ্চালন করতে পারে। মানুষের ত্বকে বা চামড়ায় ও চুলে নানারকমের কীট পরজীবী-রূপে বাস করে। কণ্ডুকীট (itch) চুলকানি রোগের কারণ। এদেরকে চাম-ও বলা হয়। এই কীটগুলি খুব ক্ষুদ্র। এদের উপাঙ্গে সরু নখ থাকে ও স্ত্রী-কণ্ডুকীট চামড়ার লোমের গর্তের ভেতর ডিম প্রসব করে। এরা মানুষের রক্ত খায়, ফলে তা খুবই কষ্টদায়ক হয়। উকুন (louse) অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথার চুল আক্রমণ করে। এরা চুল নষ্ট ক'রে দেয় ও মাথার চামড়া থেকে রক্ত শোষণ ক'রে খায়। এরা টাইফাস রোগও বহন করে। এরা চুলের গায়ে সারিবদ্ধভাবে ডিম পাড়ে। দদ্রু বা দাদ (ringworm) একপ্রকার ছত্রাক-জাতীয় রোগ। অণুবীক্ষণে এদের দেখা যায়। দাদ হলে চামড়ার ওপরকার ত্বক্ ফুলে ওঠে, ফলে ভয়ঙ্কর চুলকানি দেখা দেয় ও রস গড়ায়। শরীর ঠিক রাখতে হলে, এদের সম্পর্কে সাবধান হওয়া দরকার।

মানুষের মাথার খুলির বা করোটির গহ্বরটি বারোশ' থেকে পনেরোশ' সি.সি.। এর ফলে মস্তিষ্কের আকারও অনেক বড় হয়। মানুষ তাই আজ তার মস্তিষ্ক চালনা বা ব্যবহার ক'রে সব প্রাণীর মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করেছে।

ফলিত শিক্ষা

ছাত্র-ছাত্রিগণকে হাতে-কলমে শেখানোর জন্য মাঝে মাঝে তাদেরকে ঝোপ-জঙ্গল বা জন্তু-জানোয়ার পর্যবেক্ষণ করাতে হয়। ঝোপ-জঙ্গলে নানারকমের গাছ তারা নিজে দেখে বা মাস্টার-মহাশয়ের সাহায্যে চিনে নিতে পারে। তেমনি পশু-পাখির দেহের সমস্ত লক্ষণগুলি সম্বন্ধে তারা স্বচক্ষে দেখে জানতে পারে। গাছের পাতা, ফুল, ফল এবং স্তন্যপায়ী জন্তু, পাখি ইত্যাদির জন্যে আলাদা আলাদা সারণী তৈরি ক'রে এদের নিজস্ব বৈশিষ্টগুলি লিখে রাখলে সজীবের জীবনধারার সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে যায়। তাই নিচে কয়েকটি সারণীর নমুনা দেওয়া হ'ল। এগুলি ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে জীবন-বিজ্ঞান শিক্ষা সহজ হবে।

১নং সারণী—পাতা

তারিখ	পাতা— কোন্ উদ্ভিদের ?	পাতার আকার— সরল বা যৌগিক	খস্‌খসে বা শুঁয়াযুক্ত বা তৈলাক্ত	পাতার শিরার বিন্যাস	পাতার গন্ধ	পাতার স্বাদ
	গোলাপপাতা					
	মটরপাতা					
	কুমড়োপাতা					
	লেবুপাতা					
	তেঁতুলপাতা					
	বেলপাতা					
	উচ্ছেপাতা					

২নং সারণী—ফুল

তারিখ	ফুলের নাম	রঙ	গন্ধ	ঋতু	ফুলের ক'টি পাপড়ি—পাপড়ির আকার	ফুলের আকার	ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্রের সংখ্যা
	জবা						
	গাঁদা						
	টগর						
	বকফুল						
	অপরাজিতা						
	অতসী						

৪নং সারণী—পাখি

তারিখ	পাখির নাম	আকার	পালকের রঙ	ঠোঁট ও পায়ের গড়ন	খাদ্য কি কি ?	কি ধরনের ডাক ?	বাসা কেমন ও কোথায় করে ?	পুরুষ পাখি কেমন ?	ডিমের গঠন
	পায়রা								
	চড়ুই								
	কোকিল								
	বাবুই								
	বসন্তবৌরী								
	মাছরাঙা								
	কাঠঠোক্‌রা								

৩নং সারণী—ফল

তারিখ	ফলের নাম	আকার	গন্ধ	স্বাদ	মানুষের খাদ্য বা পশু-খাদ্য	কোন্ ঋতুর ফল ?	ফলের পাকা অবস্থার রঙ
	আম						
	লিচু						
	পেয়ারা						
	আনারস						
	শশা						
	কুমড়ো						
	লাউ						

৫নং সারণী—স্তন্যপায়ী

তারিখ	পশুর নাম	আকার ও গায়ের রঙ	গায়ের গন্ধ	খাদ্য কি কি?	স্বভাব	সন্তান-স্নেহ	গলার স্বর	একবারে ক'টি বাচ্চা দেয়
	গোরু							
	ছাগল							
	মোষ							
	ভেড়া							
	হরিণ							
	শুয়োর							

প্রশ্নমালা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১। নিম্নশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনোতে মন দেওয়ার জন্য কি কি বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার, তার একটি সঠিক বিবরণ দাও।

২। কি কি বিষয়ে আসক্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনোয় অমনোযোগী হয়?

৩। খেলাধুলায় ছাত্র-ছাত্রীদের দেহের ও মনের উপর কি কি উপকার হয়, তার বর্ণনা কর।

৪। "নিজের কাজ নিজে করো" এই নীতির উপকারিতা কি?

৫। পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য গুরুজনদের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের কি-রকম ব্যবহার করা উচিত?

৬। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

ধর্ম দ্বারা — ও ঈশ্বর-চিন্তা দ্বারা শক্তিসঞ্চয় ক'রে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর — গঠন করা দরকার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিক্ষার্থীদের — ও — সমন্বয়ে মানুষ করার প্রধান —।

৭। পরিবেশ প্রধানতঃ কয়প্রকার? শিক্ষার্থীর উপর পরিবেশের প্রভাব কেমন হয়, তার বিষয় লেখ।

৮। ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ জীবন কি-ভাবে পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে-বিষয়ে দশ লাইন লেখ।

৯। পরিবেশের সংজ্ঞা কি? প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সজীবের পরিবেশ কাকে বলে? সজীব পরিবেশের কথা লেখ।

১০। সজীব পরিবেশের বিষয় বিস্তারিত বিবরণ দাও।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১। "জড় ও জীব পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত"—এই কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

২। জড় ও জীবের প্রধান প্রধান পার্থক্যগুলি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে লেখ।

৩। উদ্ভিদের সঞ্চালন ও প্রাণীর চলন-প্রক্রিয়া কেন হয়? এদের তাৎপর্য কি? উদাহরণ দিয়ে লেখ।

৪। জীবের খাদ্যগ্রহণের সঙ্গে শ্বাসক্রিয়ার কি সম্বন্ধ লেখ।

৫। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

জড়ের কাঠামোর মধ্যেই জীবের —, জড়কে — ক'রেই তার — ও — এবং জড়ের মাধ্যমেই তার বৃদ্ধির বিকাশ। আবার মৃত্যুতে — তার পরিণতি।

৬। "আমাদের চারপাশে নানাপ্রকারের উদ্ভিদের সমাবেশ"। —কি কি উদ্ভিদ্ আমরা দেখতে পাই? তাদের বিষয় যতটা জান লেখ।

৭। "আমাদের চারপাশে নানাপ্রকারের প্রাণীর সমাবেশ"। —কি কি প্রাণী কোথায় কোথায় দেখা যায়? তাদের কি-ভাবে চেনা যায়? তাদের বিষয়ে লেখ।

৮। ভারতের জাতীয় ফুল কি? তার বিষয়ে যা জান লেখ।

৯। ভারতের জাতীয় পাখির নাম কি? তার আদিবাস কোথায় ছিল? এখন ভারতে কোথায় এই পাখি বেশী দেখা যায়? এ বিষয়ে যা জান লেখ।

১০। "বাঘ ভারতের জাতীয় পশু"—এই কথাটি বাঘের সম্বন্ধে কেন বলা হয়েছে? বাঘকে পশ্চিমবাংলার গৌরব কেন বলা হয়? বাঘের দেহের গঠন ও স্বভাবের বিষয় যা জান, লেখ।

১১। আমাদের দেশে কোন্ সময়ে আম পাওয়া যায়? আমে কি কি খাদ্যগুণ আছে? পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় কি কি ধরনের আম পাওয়া যায়?

১২। আমের মুকুল আম-চাষীরা কি-ভাবে রক্ষা করে? আম থেকে কি কি খাবারের জিনিস তৈয়ারি হয়? আমকে ফলের রাজা কেন বলা হয়? তোমার দেশে কি কি আম পাওয়া যায়, তাদের নাম লেখ।

১৩। নিম্নলিখিত বিষয়ে টীকা লেখ:
(i) অপুষ্পক উদ্ভিদ্, (ii) সপুষ্পক উদ্ভিদ্, (iii) শস্য-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (iv) সুতা-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (v) কাষ্ঠ-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (vi) তৈল-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (vii) অর্থকরী উদ্ভিদ্, (viii) ঔষধ-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (ix) ফল-প্রদেয় উদ্ভিদ্, (x) ফুল-প্রদেয় উদ্ভিদ্।

১৪। যে-কোন তিনটির বিবরণ দাও:
(ক) উভচর প্রাণী, (খ) জলজ প্রাণী, (গ) ভূ-নিম্নস্থ প্রাণী, (ঘ) খেচর প্রাণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১। কোন উদ্ভিদ্ বা প্রাণীকে সাধারণতঃ কোন্ কোন্ অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রেখে চেনা যায়, সে-বিষয় যা জান লেখ।

২। নিম্নলিখিত উদ্ভিদ্গুলিকে কি-ভাবে চেনা যায়, তার বর্ণনা দাও:
(ক) অপরাজিতা, (খ) তুলসী, (গ) গাঁদাল, (ঘ) থানকুনি, (ঙ) আমরুল।

৩। ফণিমনসা, পাথরকুচি ও অর্কিডের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ উল্লেখ ক'রে এদের বর্ণনা কর।

৪। উদ্ভিদ্-চেনার যে আদর্শ-প্রণালী ব্যবহার করা হয়, তার বর্ণনা বিস্তারিতভাবে কর।

৫। নিম্নলিখিত প্রাণীদের কি-ভাবে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখে চেনা যায়, তার বর্ণনা কর:—(ক) কেঁচো, (খ) আরশোলা, (গ) কেন্নো, (ঘ) শামুক।

৬। প্রজাপতি-দেহ বর্ণনা কর। কি-ভাবে প্রজাপতি উদ্ভিদ্-বিস্তারে সাহায্য করে?

৭। পিঁপড়ে ও মৌমাছির সামাজিক জীবন কেমন? তারা কি-ভাবে জীবন-যাপন করে? এদের দেহ-গঠন বর্ণনা কর।

৮। বোলতা ও কুমোরে-পোকার মধ্যে দেহ-গঠনে কি কি প্রভেদ দেখা যায়? এদের ঘর-বাঁধার প্রণালী বর্ণনা কর।

৯। গঙ্গা-ফড়িং ও জল-ফড়িং কি ক'রে চেনা যায়? এদের দেহ-গঠন ও চাল-চলন কেমন, তা বর্ণনা কর। লেপিস্মা কোথায় পাওয়া যায়?

১০। ডাইন-পোকার স্বভাব, দেহ-গঠন ও শিকার-পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১১। কই, শিঙি ও মাগুরের চিহ্নিত-করণের কি কি লক্ষণ আছে? আলাদা আলাদা ক'রে এদের প্রত্যেকের লক্ষণগুলি চিত্র-সহ বর্ণনা কর।

১২। সোনা-ব্যাঙ ও কুনো-ব্যাঙের বহিরাকৃতি বর্ণনা কর। এদের মধ্যে দৈহিক প্রভেদ কি কি? এরা আমাদের কি কি উপকার করে?

১৩। টিকটিকি ও গিরগিটির মধ্যে প্রভেদ কি? এরা কি-ভাবে চলাফেরা করতে পারে?

১৪। গোখুরা, কেউটে ও চন্দ্রবোড়ার বিবরণ দাও।

১৫। চোখ দিয়ে দেখে কি কি সজীব বস্তু চেনা যায়, তার দশটি উদাহরণ দাও।

১৬। নাক ও কান—এই দুটি বোধেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কি কি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিবরণ দাও।

১৭। 'স্পর্শের স্বাদ বা অনুভূতিও সজীবের পরিচয়ের সহায়ক'—কথাটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

১৮। জিভ দিয়ে কি-ভাবে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়? তার বিষয় কি জান, লেখ।

১৯। লাউডগা, ঢোঁড়া ও কচ্ছপের বিষয় যা জান, লিখ।

২০। কাক ও কোকিলের পার্থক্য কি?

২১। গিনিপিগের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকে? ছেলে-মেয়েদের সংবেদনশীল অঙ্গগুলির উপর সজীব বস্তুর চিহ্নিতকরণ-প্রণালী কতটা নির্ভর করে, তা বর্ণনা কর।

২২। শূন্যস্থান পূর্ণ কর—

শেয়ালের ডাক, হায়নার ডাক, বাঘের —, সিংহের —, এগুলি কান পেতে শুনলেই প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্ভিদের স্বর নেই — আছে ফুল ও —। জীবন-বিজ্ঞানীদের চোখ ও কান সব সময় — রাখতে হয়। অনেক উদ্ভিদ্‌কে তাদের পাতা, মূল বা ফুলের — ও গন্ধে চেনা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। উদ্ভিদের প্রতি আলোর প্রভাব কিরূপ, বর্ণনা কর। একটি পরীক্ষা বর্ণনা ক'রে উদ্ভিদের প্রতি আলোর কি ধরনের প্রভাব, তা বুঝিয়ে দাও।

২। জল জীবের জীবন। উদ্ভিদের উপর জলের কি ধরনের প্রভাব, তা পরীক্ষা দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩। মাছকে জলের মধ্যে চেপে রাখলে কেন মারা যায়? মাছ কি-ভাবে অক্সিজেন নিয়ে শ্বাসকার্য করে?

৪। একটি পরীক্ষা বর্ণনা ক'রে, উদ্ভিদ্ নিশ্বাস-গ্রহণে অক্সিজেন শোষণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত করে, তা প্রমাণ কর।

৫। কৃষ্টিজল কাকে বলে? উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে জলের মধ্যে কি কি রাসায়নিক উপাদান থাকা দরকার? উপাদানগুলি উদ্ভিদের কি কি কাজ করে?

৬। কৃষ্টিজলের পরীক্ষা বর্ণনা কর। কোন্ উপাদানের অভাবে উদ্ভিদের কি ধরনের ক্ষতি হয়, তা লেখ।

৭। শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

— উদ্ভিদের বিবিধ খাদ্য তৈয়ারিতে অংশগ্রহণ করে। — উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। মাটির ভেতরে যে-সমস্ত — লবণ থাকে, তাদের মধ্যে নাইট্রাইট, — অ্যামোনিয়া প্রধান। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের তৈয়ারি করা — একটি উপাদান। নাইট্রোজেনে গাছ — ও — হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১। নডিউল কাকে বলে? এদের কাজ কি? কি-ভাবে এরা মটর উদ্ভিদকে সাহায্য করে?

২। মটর উদ্ভিদের পাতার বর্ণনা কর।

৩। মটর ফুলের বিবিধ অঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা কর। ফুলের বিবিধ স্তবকের ছবি এঁকে চিহ্নিত কর।

৪। মটর উদ্ভিদের ফলের নাম কি? এর বীজের বিবিধ অংশ বর্ণনা কর। মটর উদ্ভিদের চাষের জন্যে কি কি সার দরকার এবং মটরে কি ধরনের খাদ্য থাকে?

৫। রুই মাছের বহিরাকৃতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৬। একটি রুই মাছ অঙ্কন ক'রে এর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চিহ্নিত কর।

৭। মানুষের হাত-পা ও মাথার বিবিধ অঙ্গগুলির বর্ণনা কর।

৮। টীকা লেখ :—

(ক) টিনয়েড, (খ) ইন্‌সিসার, (গ) বাইসেপ্‌স, (ঘ) ট্রাইসেপ্‌স, (ঙ) কাফ্-পেশী, (চ) স্পর্শেন্দ্রিয়-রেখা, (ছ) সাইক্লয়েড।

৯। মানুষের চোখ ও কান সম্বন্ধে তোমার যা জানা, তা লেখ।

১০। মানুষের জিভ ও নাকের বিষয়ে কি জান?

১১। মানুষের চামড়ায় কি কি তুমি দেখতে পাও? চামড়া পরিষ্কার করা কেন দরকার?

বিবিধ প্রশ্নমালা

১। বন্ধনীর মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দ নিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

(ক) মূলের সবশেষে একটি টুপির মতো ঢাকনা থাকে। একে — বলে।
(মূলরোম, মূলত্রাণ)

(খ) সরু সবুজ সুতোগুলিকে মটর গাছের — বলে।
(উপপত্র, অনুফলক, আকর্ষ)

(গ) ডানার মতো থাকে ব'লে এদের — বলা হয়। (ধ্বজা, পক্ষ, নৌকা)

(ঘ) ফলনশীল উদ্ভিদের পক্ষে — অপরিহার্য।

(হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম, নাইট্রোজেন)

(ঙ) মাছ ফুলকার সাহায্যে জলে দ্রবীভূত — গ্রহণ ক'রে শ্বাসক্রিয়া চালাতে পারে। (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন)

২। নিচের উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি সত্য ব'লে মনে হয়, তার পাশে 'T' লেখ, আর যেগুলি ভুল ব'লে মনে হয়, সেগুলির পাশে 'F' লেখ :—

(ক) তুলসী সারা বছরের উদ্ভিদ্। (খ) স্বাবলম্বী হওয়া একটি বড় দোষ। (গ) অভিভাবকদের কথার অবাধ্য না হওয়া, সব সময় সত্য কথা বলা, সব কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করা, অলস না হওয়া, অন্যায় করলে তা অকপটে স্বীকার করা, ইত্যাদি জীবনের ধর্মগুলি ছেলেবেলা থেকে শিক্ষার্থীদের শেখানো উচিত। (ঘ) প্রতিটি জীবের আয়ু সীমাবদ্ধ। (ঙ) চন্দ্রবোড়া ও কেউটে বিষধর সাপ নয়।

৩। উপযুক্ত শব্দ (নিচে দেওয়া আছে) দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ কর :—

জড়ের — জীবের আবির্ভাব। আবার জীবের — জড়ের সৃষ্টি। জড়কে নিঃশেষে — ক'রে জীবের বৃদ্ধি। আবার জীবের মৃত্যুতে — আত্মপ্রকাশ। সুতরাং জড় ও জীবের মধ্যে কোথাও একটা সূক্ষ্ম অথচ নিকটতম — রয়েছে যা মর্মে মর্মে — করা যায়, অথচ বোঝা যায় না। জড় ও জীব এই পৃথিবীতে দুই — মতো পরস্পর — বাস করছে।

(পাশাপাশি, জড়ের, সম্বন্ধ, বিলীনে, সমন্বয়ে, অনুভব, প্রতিবেশীর, শোষণ)